বাংলা সাহিত্যে নারী সমকামিতা
শঙ্করী মুখোপাধ্যায়

স্বত্ব © লেখক

প্রকাশক
মাজেদুল হাসান

জয়তী
৬৮ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ কুদরাত-ই-খুদা রোড
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৯৬৬০৪৬৪

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মুদ্রণ
হক প্রিন্টার্স
২১০ কালভার্ট রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য : ১২০ টাকা

Bangla Sahitye Nari Samakamita by Shankary Mukhopadhyay A Study paper on lesbianism in Bengali literature by First Published February 2015 Published by Mazedul Hasan Joyotee, 68 Concord Emporium, 253-254 Kudrat-E-Khuda Road, Kantabon, Dhaka-1205.
Joyoteenews@gamil.com www.joyoteenews.com

Price: 120 Taka USA $ 10

ISBN: 978-984-91518-4-5 Code: 0239

‘প্রেমের শরীরে মানুষ সত্য
লিঙ্গ বাধার পাহাড় নয়’

সূচি

ভূমিকা
প্রথম অধ্যায়
সমকামিতা ও নারী সমকামিতার সাধারণ ধারণা ১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়
'জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে নারী সমকামিতা'
'দুটি মেয়ের পারস্পরিক মানসিক নির্ভরতা' ২৩
তৃতীয় অধ্যায়
সমালোচনা : 'বামাবোধিনী' ও 'অভিজ্ঞান'
লেখিকা : নবনীতা সেন ৩০
চতুর্থ অধ্যায়
সমালোচনা : 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'
লেখক : জয় গোস্বামী ৪০
পঞ্চম অধ্যায়
সমালোচনা : 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' লেখিক : তিলোত্তমা মজুমদার :
নারী সমকামিতার প্রেক্ষিতে; 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' ৪৪
গ্রন্থপঞ্জি ৫৫

‘প্রাককথন’

সমকামিতাকে এখনও আমাদের সমাজে সংস্কৃতিবিরুদ্ধ আচরণ বলেই বেশিরভাগ মানুষের ধারণা। অধিকাংশ মানুষই এই সম্পর্ককে অশ্লীল আচরণ বলেই ইঙ্গিত দেয়। এই সম্পর্ককে বিকৃত ও অস্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি বলে মনে করে এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে বক্তব্য রাখতে ও অভিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে মৌন থাকে। এই বিষয়ের প্রতি কিছু বদ্ধমূল ধারণাকেই এর মূল কারণ বলে ধরে নেওয়া যায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাধারণত লেখক-লেখিকারা সেইসব বিষয়কে নিয়ে লেখার ঝুঁকি নিতে চান না, যে বিষয়কে সর্বসাধারণ মান্যতা দেয় না। ‘নারী সমকামিতা’-র বিষয়টাও সেই রকমই এক স্পর্শকাতর ক্ষেত্র। তবুও কিছু দরদি লেখক, লেখিকা সম্প্রতি এই বিষয়কে পাঠকের সামনে আনার ঝুঁকি নিয়েছেন, এ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণাকে পরিবর্তন করার কাজে।

আমার পরিবেশনার বিষয় নারী সমকামিতা। তাই এ বিষয়কে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে সাহায্য করে, এরূপ কয়েকটা উপন্যাসের সাহায্য আমি নিয়েছি (চাঁদের গায়ে চাঁদ’; ‘বামাবোধিনী’ ও অভিজ্ঞান’; ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল’)। বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে নারী সমকামিতা বিষয়ে কোনো গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে কি না, আমার সঠিক কিছু জানা সম্ভব হয়নি। তথ্যের অভাবে এ সম্পর্কে অনেক বিষয়ই আমার এখনও অজানা আছে। তবুও স্বল্প পরিসরে এটুকুই বোঝাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে নারী সমকামিতা ভীষণভাবে মনস্তাত্ত্বিক। শুধু যৌনপ্রবৃত্তি দিয়ে একে নির্ধারিত করা যায় না। এর জন্য সংবেদনশীল মনের ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

আমার বিষয়-নির্বাচন ও সে বিষয়ে দুটো কথা বলার মতো মানসিক সাহস ও তথ্যের জ্ঞান আমি যাঁর থেকে পেয়েছি, তিনি হলেন অধ্যাপক ড. অমিতাভ চক্রবর্তী। তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে এই বিষয়ে উন্মুক্ত চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নন্দিতা বসু, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা সেন ও শ্রীমতী সুদীপ্তা বসু আমাকে নানা সময়ে এই বিষয়ে সাহায্য করছেন। আমি তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ছাত্রী হিসেবে আমি এঁদের

অনেকের থেকেই বয়সে বড় কিন্তু ক্লাসঘরে বিদ্যা পরিবেশনার সময় কখনই আমার এ কথা মনে হয়নি। কারণ, আমাকে ছাত্রী জ্ঞানেই এঁরা আমার সমস্ত জিজ্ঞাসাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই পাওয়া আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া মনে করি। সামাজিক যাবতীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সময় ও তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আমি আন্ত রিকভাবে কাজটি করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমার স্বামী দীপঙ্কর মুখার্জী আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কানাডায় অভিবাসী আমার বন্ধু প্রখ্যাত চিত্রকর মহিবুল ইসলাম তাঁর চরম ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের অমূল্য সময় ব্যয় করে আমার বইয়ের প্রচ্ছদটি এঁকে দিয়েছেন শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

পরিশেষে প্রকাশনীর প্রত্যেককে গ্রন্থটি প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

শঙ্করী মুখোপাধ্যায়

ময়ূর বিহার, ফেজ-১
নয়াদিল্লি
২০১১

ভূমিকা

খ্রিস্টধর্মের মৌল তত্ত্বকথায় আছে 'আদিপাপবর্জিত জন্ম', বা ভারতীয় পুরাণ ও উপকথাতে আছে 'অযোনিসম্ভব' আবির্ভাব' (*Virgin Birth*)? যেমন—'সীতার জন্ম লাঙলের ফলায়, উর্বশীর জন্ম জহ্নুমুনির জঙঘা থেকে, দ্রৌপদীর জন্ম হোমাগ্নি থেকে, বৌদ্ধশাস্ত্রে মাতা আম্রপালী পূর্ণযৌবনা স্বয়ম্ভূরূপে আম্রকাননে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এগুলো উপকথা মাত্র। হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের মর্মমূলের তত্ত্বকথা নয়।

অপর পক্ষে খ্রিস্টান ধর্ম নরনারীর জৈব সম্পর্কের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। খ্রিস্টধর্মে যাজকদের বার-বার আদম-ঈভের আদিপাপ থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে বলেছেন : "What does it matter whether it be in Person of mother or sister: We have to be beware of Eve in every woman" (নারীর মূল্যজ্ঞ শরৎচন্দ্র)। কিন্তু তথাপি একথা মানতে আমরা বাধ্য যে, প্রকৃতি-পুরুষের আবশ্যিক মিলনের মাধ্যমেই সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহে জীবের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এই ধ্রুব সত্যকে শুধু ভারতীয় ঋষিরাই নয়, প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতা মেনে নিয়েছে খ্রিস্টের জন্মের কয়েক সহস্রাব্দি পূর্বকাল থেকেই। হিন্দুশাস্ত্র বলে; একই সত্তা সৃষ্টির জন্য নারী-পুরুষ রূপে দ্বিরূপপ্রাপ্ত হয় নিরাকার। আত্মসংযম বা ইন্দ্রিয়সংযমের বিধান ধর্মে থাকলেও, কোথাও কোনো ধর্মেই গৃহীদের ক্ষেত্রে 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'-র কথা বলা নেই। প্রজনন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কোনো সভ্যতাই সার্বিকভাবে অস্বীকার করেনি।

যে দিন থেকে মানবসভ্যতা প্রজননকে গুরুত্ব দিতে শুরু করল, নারীর যৌনতাকে শৃঙ্খলিত করা হল প্রজননের ক্ষেত্রে সীমিত রেখে। বিবাহ-প্রথার মাধ্যমে নারীকে নির্দিষ্ট স্বামীর (পুরুষের) সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হল। নারী নিজের সহজাত স্বাভাবিক যৌনসম্ভোগের স্বাধীনতা হারাল। সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগের সমাপ্তির পর থেকে আজ অবধি চলে আসছে নারীর স্বাভাবিক যৌন কামনাকে বেঁধে রাখার ইতিহাস। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে এই বাঁধনকে পোক্ত করতে। সতীত্ব, উপাচার, সন্তান, ধর্ম, পরিবার, ন্যায়-নীতি, সবই দিয়েছে তাকে তার নিজের কথা ভুলিয়ে রাখার জন্য। তাকে এসব দিয়ে বোঝানো হয়েছে সন্তান, ধর্ম, স্বামী, পরিবার-পরিজন এদের প্রতিপালনেই তার আসল সুখ– এরা সুখে থাকলেই নারীর প্রকৃত সুখ।

অথচ বৈষ্ণব ধর্ম বলে; "পুরুষসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন রাধা। রাধা ও গোপীদের শর্তেই পরিচালিত হত দেহ-মিলন। নারীর সেবা ও সুখবিধান ছিল এ মিলনের উদ্দেশ্য। নারীদেহের সুখবোধ সুখ-অনুভবের কেন্দ্র ও অঙ্গ ভিন্ন। নারীরা পুরুষকে শেখাত এই তত্ত্ব। দেহমিলনে বৈদিক স্বামীর অধিকার বা কর্তৃত্ব ছিল না। পুরুষের সন্তান উৎপাদনের বা জাত সন্তানের অধিকারও ছিল না পুরুষের। চৈতন্যলীলায় ব্যাস, বৃন্দাবন দাস ছিলেন শ্রীনিবাস পরিবারের বিধবা নারায়ণীর সন্তান, পিতা অজ্ঞাত।...পুরুষতন্ত্র নারীকে কামিনী ও কামের প্রতিমূর্তি বলে প্রচার করেছিল।" (অন্য এক রাধা, শক্তিনাথ ঝা) পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষকে দিল অগাধ স্বাধীনতা। সেখানে রাধা হল প্রেমিকা অন্যদিকে তারা কৃষ্ণকে কাম স্বরূপ বললেন। কৃষ্ণলীলায় কাম ও বহুগামিতা পুরুষ-কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য ধার্য হল। ভারতীয় দেবতাচরিত্রে এবং সমাজে পুরুষদের এসব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হল। পুরুষ পেল বহু-বিবাহের স্বাধীনতা, যেখানে নারী পেল সহমরণ, সতীত্ব। সেই থেকে এতাবৎ কাল, হিন্দুধর্ম, কোরান-হাদিস, বাইবেল কেউই দেয়নি নারীকে সমলিঙ্গের অধিকার। কোনো ধর্মেই দাসীবৃত্তি ছাড়া নারীর আর কোনো কাজই সমাজে ও ধর্মে নির্দেশিত হয়নি। কবি তুলসিদাস বলেছেন :

"ঢোল গাঁওয়ার শূদ্র-পশু-নারী,
ইয়ে সব হ্যায় তাড়নাকে অধিকারী।"

এই হল নারীর যুগযুগান্তের দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

"কোথায় জুড়াই?
হায় স্থান কোথা পাই?
নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক হব—যে আবাসে গিয়া,
কোথা সে ভবন?"

—শ্রীযুক্ত সরলাবালা সরকার

এ নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক ভবন যে বহু ক্ষেত্রেই আরেক সমব্যাথী নারীর মনে হতে পারে, এতে আর সন্দেহ কোথায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি কর্ণপুর যাকে বলেছেন 'মৈত্রী'। এই মৈত্রীকে কর্ণপুর বলেছেন অসমপ্রয়োগ বিষয়া রতি এবং 'স্পর্শ দিকোচিতা'। এই বিশ্লেষণে টীকাকার বিশ্বনাথ বলেছেন 'স্ত্রীনাং' পরস্পর যথেষ্ট স্পর্শাদি ব্যবহারে দোষ নাস্তি। তাই নারীতে-নারীতে হয়; যে গোপন কথা, সখ্যতা, প্রেম, ভালোবাসা। তাকে বিজ্ঞান নাম দিল 'নারী সমকামিতা'।

এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার কারণ আমার পরিবেশনার বিষয় এখানে 'নারী সমকামিতা বা 'লেসবিয়নিজম'। এ বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃত বলে তাদের তির্যক চোখে দেখা বা একঘরে করে রাখা হবে।

সমকামিতার ইতিহাস বহু প্রাচীন। মানুষের সমকামী হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। যদিও কিছু মানুষ সমকামিতার অঙ্কুর নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সমকামিতা নিয়ে মানুষের ভুল ধারণা যে সমকামিতার ক্ষেত্র বুঝি তবু শারীরিক, আসলে সমকামিতা ভীষণভাবে মনস্তাত্ত্বিক, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সমস্যাটাই তাদের বহুদিনের আত্মদমনের সংস্কৃতির পাঠ থেকেই অঙ্কুরিত হয়ে মন ও শরীর দুয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। ফলে সঠিক কারণগুলোর সনাক্তকরণ সবসময় সম্ভব হয় না। আধুনিক বিশ্বে লেসবিয়নিজম সমাজের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে, এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের বহু ক্ষেত্রেই সম্যক ধারণা নেই।

নারী সমকামিতা বিষয়টিকে সরলভাবে উপস্থাপন করার জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে পরিবেশনা করেছি।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বাংলা উপন্যাসের সাহায্য নিয়েছি;
'বামাবোধিনী' ও 'অভিজ্ঞান' : নবনীতা দেবসেন
'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' : জয় গোস্বামী
'চাঁদের গায়ে চাঁদ' : তিলোত্তমা মজুমদার

আলোচিত অধ্যায় ও উপন্যাসের মাধ্যমে নারী সমকামীরা যে অপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক কোনো নারী নয়, তারাও আমাদেরই মতো স্বাভাবিক নারী—এটাই সাধ্যমতো বলার চেষ্টা করেছি। বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত এই বিষয়ে এর আগে কোনো কাজ তেমনভাবে হয়নি। স্বল্প পরিসরে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পর্যালোচনা এক কথায় অসম্ভব। পরিবেশিত বিষয়ে সীমিত জ্ঞানের জন্য যদি ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, আমি তার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

শঙ্করী মুখোপাধ্যায়
Shankari.mukherji@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

‘সমকামিতা ও নারী সমকামিতার’ সাধারণ ধারণা

মনুষ্যসমাজে সমকামিতার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সমকামিতা নিয়ে মানুষের প্রচলিত ভুল ধারণার অভাব নেই। অনেকেই মনে করেন, সমকামিতার ক্ষেত্র বুঝি শারীরিক, আসলে সমকামিতা বহুক্ষেত্রেই ভীষণভাবে মনস্তাত্ত্বিক। স্বাভাবিক নারী-পুরুষের মতো তারাও একে অপরের প্রতি বাঁধভাঙা প্রেম অনুভব করে। লিঙ্গভেদে সমকামী আবশ্যিকভাবে দুই জাতির; নারী ও পুরুষ। পুরুষ যদি পুরুষের প্রতি স্বভাবগতভাবে আসক্ত হয়, এবং নারী কোনো নারীর প্রতি, তখন আমরা সেই ব্যতিক্রমী যৌনচেতনার মানুষকে বলি ‘সমকামী’।

পুরুষ সমকামী (gay) এবং নারী সমকামী (Lesbian) উভয় জুটিতেই স্বাভাবিক নারী-পুরুষের সম্পর্কের মতোই টানাপোড়েন এবং জটিল বাঁক রয়েছে। লেসবিয়ান এবং গে, উভয় জুটিতে একজন পুরুষালি স্বভাবের (butch) এবং অপরজন কিছুটা মেয়েলি (fem) স্বভাবের হয়। সাধারণভাবে অনেক সময় গে কিংবা লেসবিয়ান জুটিকে দেখলে বাহ্যিকভাবে বুচ এবং ফেম সনাক্ত করা যায়।

একজন মেয়ে এবং অপর জন পুরুষালি হবার কারণে গে এবং লেসবিয়ান উভয় জুটিতেই পারস্পরিক সম্পর্ক নারী-পুরুষের সম্পর্কের মতোই স্বাভাবিক। তাছাড়াও গে-লেসবিয়ানের পাশাপাশি অনেকে বাইসেক্সুয়ালও হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় দু’জন নারী বা দু’জন পুরুষের মধ্যে সাময়িক শারীরিক সম্পর্ক থাকলেও তারা সমকামী না-ও হতে পারে।

সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ভিন্নতা ছাড়া তারা দর্শন এবং মননে সম্পূর্ণ অন্যদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ। সমকামিতা শুধু যৌনপ্রবৃত্তি দিয়েই নির্ধারিত হয় না। বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় সমকামীর সংজ্ঞা হল : “Since its coming, the term homosexuality had acquired multiple meanings in the original sense, it refers to a sexual orientation characterized by aesthetic attraction, romantic love, and sexual desire exclusively for members of the same sex or gender identity. It can also refer to the

faifestation of that orientation in the identity of an individual, which may or may not be at odds with that Person's sexual behavior finally, it can refer to sexual relations with another of the same sex to sexual relations with another of the same sex regardless of one's sexual orientation, self identification or gender identity."

(অনলাইন উইকিপিডিয়া)

সমকামিতা বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কুসংস্কার রয়েছে মানুষের মনে তার মূলে কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা আছে। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে প্রবল সাধারণ মানুষ যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতাকে একটা নিজস্ব পছন্দ মনে করে। Time পত্রিকায় বিগত একটা সংখ্যায় প্রকাশিত মাইকেল ডি. লেমনিকের লেখা একটা প্রতিবেদন, এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত। লেমনিক লিখেছেন :

"Sure enough, when the Swedish scientists ran the experiment this time, The results were striking! When gay men were exposed to male Pheromones, their hypothalamus lit up just like a women's female hormones did nothing of them. What the study does not show, however-despite what some scientists claimed-is that sexual preference is biologically hardwired and thus present from birth. That idea is pretty much accepted by most gays and many biologists as well. But it is reputed by those – generally on the religious right. Who have a stake in believing that homosexuality is a personal choice rather than an inborn trait."

(Time, Asian Edition, 23 May, 2005)

এই তত্ত্ব গ্রিক পণ্ডিত হোমারের জানা ছিল। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো সমকামিতার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তার Symposium-এ তিনি তিন প্রকার যৌনপ্রবৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন। এবং গ্রিক ও রোমান ধর্ম, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে তার অস্তিত্ব প্রমাণেও সচেষ্ট হন।

ভারতীয় পণ্ডিত বাৎস্যায়নও এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে একটি অধ্যায়ে তিনি সমকামিতা নিয়ে লিখেছিলেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে বই থেকে সেই সম্পূর্ণ অধ্যায়টির বিলুপ্তি ঘটে। ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে ও বেশ কিছু মিথুনমূর্তির মধ্যে নারী সমকামিতা পাওয়া গেছে। যেমন, কোনার্ক-এর জগমোহন মন্দিরে। (ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন পৃ. ১৯০)। অথচ ভারতীয় হিন্দুধর্মে সমকামিতা সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, হিন্দুশাস্ত্র এই বিতর্ক সুনিপুণভাবে এড়িয়ে গেছে।

সমকাম ও খ্রিস্টধর্মের বিরোধ সর্বজনবিদিত। সমকাম পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশি নিন্দিত হয়েছে এই ধর্মেই। অথচ প্রাচীন প্যাগানদের (রোম ও গ্রিক) বাদ দিলে সমপ্রেমের তথা সমকামের অনুশীলন এই মতাবলম্বীদের মধ্যেই দেখা যায়। ইহুদিধর্মে সমপ্রেমের অবাধ প্রচলন ছিল। আদি বাইবেলে তার অনেক সূত্র রয়েছে। মনে করা হয়, প্যাগান ও ইহুদিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য খ্রিস্টীয় শাস্ত্রকারগণ এই সমকাম-বিরোধিতা আমদানি করেন। সবচেয়ে বেশি সমকামী এই ধর্মেই দেখা যায়। যেমন—মারলো, শেক্সপিয়র, বায়রন, অস্কার ওয়াইল্ড, দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো থেকে বর্তমানের উইলফ্রেড ওয়েন, এলটন জন, জর্জ মাইকেল প্রমুখ বেশিরভাগ গুণী মানুষরাই সমকামী।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে ৪৫০টিরও বেশি প্রজাতি সমকাম অনুশীলন করে। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদন বলে, সেখানকার সেন্ট্রাল পার্ক পশুশালায় একজোড়া পুরুষ পেঙ্গুইন নিজেদের সঙ্গী নির্বাচন করেছে। নিউইয়র্ক শহরে অনেক পেঙ্গুইন এরূপ সমসঙ্গী নির্বাচন করেছে বলে খবরে প্রকাশ। হয়তো অনেকে জানেন না বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন, পেঙ্গুইন, গিরগিটি, ভেড়া, চিত্রিত হায়না (Spotted hyena) বা বোতলনাক ডলফিনের মতো প্রাণীও সমকামে অভ্যস্ত। জাপান, জার্মানির পশুশালাগুলোতেও পেঙ্গুইনদের সমসঙ্গী নির্বাচন করে নিতে দেখা গেছে। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে সমকামিতা কোনো অস্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি নয়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমকামিতা নিয়ে আলোচনার সূচনা করেন জার্মান পণ্ডিত ওয়েস্টফল। তিনি বার্লিনে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করতেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। অধ্যাপক ওয়েস্টফলের মতে, এই সমকামিতার প্রবণতা বংশানুক্রমিক। রোগীর স্বেচ্ছা-আহরিত নয়। ফলে এটাকে 'পাপ' বলে চিহ্নিত করা অন্যায়। তাঁর মতে, বংশানুক্রমিক রোগের প্রভাবে স্নায়বিক হেতুতে কোনো কোনো মানুষ নিজ লিঙ্গের অন্য মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এজন্য তাকে বিকৃতমনস্ক মনে করা ভুল। তাঁর মতে, এটি মানসিক ব্যাধি, যার চিকিৎসা সম্ভব।

The man, however, who more than anyone else, brought to light the Phenomena of sexual inversion had not been concerned either with the medical or the criminal aspect of the matter. Karl Heinrich Ulrichs (b. 1825) who for many years cxpounded and defended homosexual love,... was a Hanoverian Legal officers and himself a sexually inverted Person. (Ellis, Havelock, Psychology of sex)

সমকামিতার যৌনাচারের প্রকার হিসেবে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার কাজে আইনজীবী কার্ল-

হেনরিক উলরিকের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি প্রথম এই বিষয়ে জনসাধারণকে সম্যকভাবে অবহিত করেন। কার্ল-হেনরিক উলরিক (১৮২৫-১৮৯৫) ছিলেন জার্মানির একজন অগ্রবর্তী সমকামী-অধিকার কর্মী। তিনি ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৭ অবধি হ্যানোভার রাজ্যের হাইডেনশিমের জেলা আদালতে সরকারি আইন পরামর্শদাতার চাকরি করেন। ১৮৫৯ সালে সমকামিতার জন্য তাকে বিতাড়িত হতে হয়। সমকামিতার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া এক ব্যক্তির সপক্ষে তাঁর আইনি ও নৈতিক সমর্থনপত্র তিনি এ সময়ে লিখে দেন। এখান থেকে শুরু হয় তাঁর প্রথম সমকামী-অধিকার আন্দোলন ও কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করেন ও সমকামীদের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। সমকামকে তিনি Urainism নামে অভিহিত করেন। Urainian শব্দটি এসেছে গ্রিক Uranos থেকে। তিনি এই শব্দটি গ্রহণ করেন প্লেটোর তত্ত্বের প্রেমের দুই দেবতা Pandemian Eros ও Uranian Ero-এর নাম থেকে। এরা বিপরীতরতি ও সমরতির দেবতা ছিলেন। উলরিক স্ত্রী সমকামীদের Urninds, উভয়কামীদের Uranodionings ও ট্রানসেক্সুয়ালদের Zwitter নামে অভিহিত করেন।

এই স্বনামধন্য সমকামী-অধিকার কর্মীর সম্মানার্থে ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান অ্যান্ড গে ল' অ্যাসোসিয়েশন বাৎসরিক 'কার্ল হেনরিক উলরিক পুরস্কার প্রদান করে।

হ্যাভলক এলিস থেকে এই দীঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ সমকামীরা আদৌ অবাস্তব নয়, এ কথার পুষ্টি জোগাবার জন্য। এরা অস্বাভাবিক হতে পারে, ফলে এরা মূলধারার অনুসারী না হলেও অপ্রাকৃত কোনো কিছু নয়। অনেক প্রগতিশীল বিদেশি সমাজ এই সমকামীদের অসামাজিক বলে মনে করে না, যতক্ষণ-না সমাজের মূলধারায় এরা বাধা সৃষ্টি করে।

সমকামিতা ও সমকামিতা বিষয়কে সমালোচনার ক্ষেত্র ১৯৯০-এর দশক থেকে একটি স্বতন্ত্র সমালোচনার ধারা হিসেবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং নারীবাদী পাঠের অঙ্গ হিসেবে সমকামী পাঠের বিষয়টি ধীরে ধীরে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠেছে।

"Lesbian and gay literary theory emerged prominently as a distinct field only by the 1990s ¾ There is nothing about it, for instance, in Terry Eagleton's literary theory: An introduction (1983), or in the first edition of Roman Selden's A reader's Guide to contemporary literary theory (1985). As with women's studies twenty years before, the growing significance and acceptance of this new field is indicated by the presence of 'Lesbian and gay studies' sections in many mainstrean bookshops and Publishers' academic catalogues, and by the establishment of relevant undergraduate courses, for

which there is now a course reader, The lesbian and gay studies Reader, Published in 1993. There is also a relevant MA course, 'sexual dissidence and cultural change', at the University of Sussex. The field is strongly multi-disciplinary. With perhaps a perdominance of cultural studies over literary material."

(Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory. Peter Barry).

কিন্তু লেসবিয়ান বা গে সমালোচনা কেবল লেসবিয়ান অথবা গে-দের স্বতন্ত্র আগ্রহের বিষয় নয়। লেসবিয়ান ও গে সমালোচনা কেবল সমকামী নারী-পুরুষদের জন্যে কিংবা সমকামী লেখকদের দ্বারা বা তাদের উদ্দেশ্যে অথবা সমকামী পাঠকদের উদ্দেশ্যে নয়। বরং নারী-পুরুষ লিঙ্গ বা লৈঙ্গিক প্রবণতার সকলের জন্য প্রযোজ্য। সমকামী লেসবিয়ান এবং গে সমালোচকদের মতে নারীবাদী সমালোচনা যেখানে লিঙ্গ বিষয়ক; সমকামী পাঠ সেখানে যৌনতা বিষয়ক। লেসবিয়ান ও গে তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল, এই তত্ত্ব লৈঙ্গিক পরিস্থিতিকে বুঝবার এবং বিশ্লেষণ করার জন্য মৌলিক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে প্রস্তুত করার পরামর্শ দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নারীবাদী সমালোচনার মতো সমকামী সমালোচনারও একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে, বিশেষত সমাজের প্রতি একটি বিরোধাত্মক প্রতিন্যাস আছে। কারণ এটা সমকামভীতি (Homophobia), বিসমকামিতা (Heterosexism) এবং বিসমকামী সুবিধাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলনকে প্রতিহতকরণের বিষয়ে অবহিত করে।

(Beginning theory/Petter Barry) পিতৃতান্ত্রিক শোষণের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে বিভিন্ন বিষয় থেকে উদ্ভূত হয়ে নারী সমকামিতা নারীদের নিজেদের ভেতরের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কসমূহের অবকাঠামোকে মৌলিকভাবে পুনর্গঠিত করে একটি প্রতিবাদী অবকাঠামো গড়ে তোলে। অতএব বলা যেতে পারে যে লেসবিয়ানিজম কোনো স্থায়ী অপরিহার্য পরিচিতি নয়। বিখ্যাত লেখক জুডিথ বাটলার তাঁর inside/outside নামক গ্রন্থে Lesbian theories, Gay theories প্রবন্ধে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে; "লিঙ্গ পরিচিতিসহ সকল পরিচিতিই এক ধরনের ছদ্মবেশ, অভিনয় এবং এক ধরনের নিকটবর্তিতা, মূল বিষয় নয় (a kind of liitation for which there no original)। বিষয়টি বিভিন্ন অবস্থানের ভেতর নিয়ত পরিবর্তনশীল হিসেবে পরিচিতির এক উত্তর-আধুনিক ধারণার প্রতি দিকনির্দেশ করে।"

(আধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব /রসিদ আসকারী।)

যেহেতু সমকামিতা কোনো জন্মগত লক্ষণ নয়, অতএব সমকামিতার এবং

বিসমকামিতার মধ্যকার পার্থক্য অতটুকু—যতটুকু নিজের এবং অন্যের মধ্যে প্রভেদ। 'অন্য' এমনই একটি বিষয়, যা যতটা আমাদের ভেতরে ততটাই বাইরে এবং গভীর অর্থে 'আত্মতা' এবং 'অন্য' একে অপরের সাথে ততই সম্পর্কিত। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বাইরের হিসেবে যা পরিচিত বা বস্তুত আত্মারই অংশবিশেষ।

যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে আমরা নারী সমকামিতা, (লেসবিয়ানিজম) ক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছি সেহেতু ইতিহাসের প্রথম সমকামী রমণী; গ্রিক মহিলা কবি 'স্যাফো' কে (জন্ম খ্রিঃ পূর্ব ৬৫০) আলোচনায় অগ্রগণ্য বলে মনে করি। তাঁর জন্ম ঈজিয়ান শহরের 'লেসবস' দ্বীপে হয়েছিল। কবি স্যাফোর জন্মস্থান থেকেই ইংরেজি ভাষায় রচয়িত হয় একটি শব্দ; Lesbian; যার অর্থ 'সমকামী স্ত্রীলোক' এবং সমকামী স্ত্রী বলতে সমস্ত ভাষাতেই আজও 'লেসবিয়ান' শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

"প্রকৃতপক্ষে নারী সমকামী বা লেসবিয়ান একজন উন্নত নারীর চাইতে বেশি বা কম অবিকশিত নারী নয়। ব্যক্তির ইতিহাস একটা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত অগ্রগমন নয়; প্রতিটি মুহূর্তে, বলতে গেলে, অতীত পুনর্বিবেচিত হচ্ছে, নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং 'নির্বাচনের স্বাভাবিকত্ব' একে অধিকতর সুবিধাজনক মূল্য দেয় না—এর বিশুদ্ধতা অনুযায়ী অবশ্যই এর মূল্যায়ন হবে। সমকামিতা নারীর কাছে তার পরিস্থিতি থেকে পলায়নের একটা ধরন অথবা এটাকে মেনে নেওয়ার একটা পথ হতে পারে।" (স্ত্রীলিঙ্গ / সিমন দ্য বোভোয়ার / অনুবাদ : লতিকা গুহ)।

মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানিকদের একটা ভুল ধারণা বলেই মনে হয় যে, তারা এই বিষয়টাকে নৈতিকতার দোহাই দিয়ে অ-প্রাকৃত মনোভাব বলে গণ্য করেন এবং এর অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলোকে অগ্রাহ্য করে থাকেন।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নারীকে ভোগ্যপণ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহাভারতে বলেছেন, গাভী যেমন নতুন-নতুন তৃণ ভক্ষণ করতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ নারীরাও নিত্যনতুন পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করতে বাসনা করে থাকে। ভীষ্মের কথায় নারীর মতো কামোন্মত্ত আর কেউই নয়। কাষ্ঠরাশি দিয়ে যেমন অগ্নির, অসংখ্য নদীর দ্বারা যেমন সমুদ্রের ও সর্বভূত সংহার দ্বারা যেমন অন্তরের তৃপ্তি হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি হয় না। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে, মেয়েরা তখনই সতী হয় যখন তাদের নিভৃতি নেই, সুযোগ নেই, আর প্রার্থী পুরুষ নেই। তাই নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কে প্রচণ্ড বৈষম্য লক্ষ করা যায়। এই জন্যেই শাস্ত্রে নারীকে সতীত্বের অলঙ্কারে সাজানো হয়েছে। সতীত্ব সর্বদা নারীর পালনীয়। নারী একটা সত্তা যাকে ব্যবহার করা হয় বিষয় হিসেবে, ফলে তার যৌনক্ষুধা অনেক ক্ষেত্রেই যা পুরুষের দেহে তৃপ্ত হয় না, অতৃপ্ত থেকে যায়। তবে সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা হয় তার গর্ভে একটি শিশুকে স্থাপন করে। কিন্তু এই সমাজবিদিত স্বাভাবিকত্ব কম-

বেশি সামাজিক স্বার্থের দ্বারা নির্দিষ্ট। এ বিষয়ে বিসমকামীরাও অন্যান্য সমাধান অনুমোদন করে। সমকামিতা নারীর শরীরের নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে, তার অপারগতার সঙ্গে, তার স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের জন্য অন্যান্য প্রচেষ্টার মধ্যে একটা প্রচেষ্টা। বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে প্রতিটি কিশোরী ভেদকরণ ও পুরুষ-প্রাধান্যকে ভয় পায়। পক্ষান্তরে নারীদেহ তার কাছে একটা কামনার বস্তু। এবং পুরুষের কাছেও তা কামনার বস্তু। অন্যদিকে যদি প্রকৃতির কথা বলা হয়, তবে সব নারীই প্রাকৃতিকভাবে সুপ্ত সমকামী প্রবণতাসম্পন্ন। নারীদেহ নারীকে শঙ্কিত করে না; তার বোন ও মায়ের সঙ্গে তার প্রায়ই একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়। যাতে অবচেতনে স্নেহ-ভালোবাসা সূক্ষ্মভাবে যৌন অনুভূতিতে রঞ্জিত হয়। মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক স্পর্শ ও ঘনিষ্ঠতা তা সাধারণভাবে তথাকথিত শালীনতাকে লঙ্ঘন করে না। তাদের আদর-সোহাগে কোনও কুমারীত্ব নাশের ভয় থাকে না। যৌন ভেদকরণও থাকে না অথচ কৈশোরের যৌন উত্তেজনাকে তৃপ্ত করে। কুমারী মেয়েটা কোনো নতুন অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা ছাড়াই তার বৃত্তিটা উপলব্ধি করতে পারে।

"আমাদের দেহ আমাদের শরীরের এক সহৃদয় দর্পণ,
আমাদের চান্দ্র চুম্বনগুলি বিবর্ণ কোমল,
আমাদের আঙ্গুলগুলি নয় বিক্ষত, নাই তাতে ধৃষ্টতার কণামাত্রও
আর বন্ধনী যখন সব আপনা থেকে খুলে যায়
আমরা একই সাথে প্রেমিকা ও ভগিনী।"

(র‍্যনে ভিভিঅ্যাঁ, 'হাত ধরাধরির মুহূর্ত' hh'tteure desmains jointly/ দ্বিতীয় লিঙ্গ/অনুবাদ : লতিকা গুহ)

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র, মানুষ সহজাতভাবেই বন্ধু খোঁজে। একজন মেয়ের জগৎ, তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ আরেকজন মেয়ের সাথেই বেশি মেলে। একই ব্যাপার হয় পুরুষের ক্ষেত্রেও। নারীর মূল্যবোধ পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষের মূল্যবোধ নারীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। বলা যায়, সমকামিতার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ নারী-পুরুষের মূল্যবোধের পার্থক্য। তাছাড়াও মনে হয় নারী সমকামীদের আধিক্যের পেছনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি বিদ্রোহ এবং পুরুষালি গোয়ার্তুমির ভূমিকাও অনেকখানি। অতএব 'নারী' উৎক্রমে যে ব্যাখ্যা করতে হবে, তা নারীর পছন্দের সার্থক দিক নয়, ফলত এর নেতিবাচক প্রভাবে সে আকৃষ্ট হয় মেয়েদের প্রতি রুচির জন্য নয়, এই রুচির স্বতন্ত্র চরিত্রের জন্য। কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে লেসবীয় নারীরা আত্মগোপন করে থাকার চেষ্টা করত এবং করে। কারণ সর্বকালের সমাজের চোখেই এই যৌনক্রিয়া অন্যায়, প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অসামাজিক ও পাপ। তথাপি আমাদের বর্তমান সমাজেও লেসবিয়ান আচরণ আছে এবং কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে এ বিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ।

আসলে একটি স্বাভাবিক নারী বলতে আমরা যা বুঝি, নারী সমকামী বলতে এর থেকে আলাদা কিছু নয়। এই রুচির স্বতন্ত্র চরিত্রের জন্য এরা বিবেচিত কিন্তু আলাদা করে এর কোনও সংজ্ঞা হতে পারে না। আমাদের মূল ভ্রান্তিটা হল এই যে "স্ত্রীলোক মানবীয় সত্তার পক্ষে নিজেকে একটি মেয়েলি নারী বানানো স্বাভাবিক : এই আদর্শটা উপলব্ধি করার পক্ষে অসমকামী হওয়া, এমনকি জননী হওয়াও যথেষ্ট; 'প্রকৃত নারী' একটি সৃষ্টি যা সভ্যতা বানায়, যেমন আগে নপুংসকদের বানানো হয়েছিল।" (সিমন দ্য বোভোয়ার/স্ত্রীলিঙ্গ) অতএব, বহুক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর চাপ থেকেও সমকামী প্রবণতার জন্ম হয়। সেখানে মনস্তত্ত্ব ও শরীরগত শর্ত একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে।

"আমি এক নারী, তাই তোমার লাবণ্যে নেই অধিকার আমার...
নরের কদর্যতায় আমার আহুতি
আমি বঞ্চিত তোমার কেশদামে, আঁখি দুটিতে
কারণ দীর্ঘ সুবাসিত কেশরাশি তোমার।"

(র‍্যনে ভিভিয়্যাঁ, সিমন দ্য বোভোয়ার, অনুবাদ : লতিকা গুহ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে নারী সমকামিতা’

‘দুটি মেয়ের পারস্পরিক মানসিক নির্ভরতা’

জীবনকে অতিক্রম করে যেমন কোনো মানবিক অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নয়, তেমনই বাস্তব উপাদানবিহীন ও মানসিক তাৎপর্য ব্যতিরেকে কোনো উপাদানই মানবিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতএব, জীববিজ্ঞানীরা যে শরীররূপ বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করে বিভিন্ন বিজ্ঞানতত্ত্বের বর্ণনা করেন, তার মূল্য থাকে না যদি-না দেহ বা শরীর রূপের বিষয়টার মধ্যে প্রাণরূপী বিষয় বাস করে। এই প্রাণরূপ বিষয়কে আবার মন সঞ্চালন করে, যাকে আমরা আত্মা বলে জানি তার দ্বারা শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয় চালিত হয়। অর্থাৎ, এই মন বা আত্মার কোনও লিঙ্গ নেই। একথা অস্বীকার করা যায় না এবং মন বা আত্মা শরীরের কোনো বিশেষ অংশে অবস্থান করে বলেও মনে হয় না। অতএব, শরীরের কোনো অংশই আত্মার অগোচর নয়। আত্মাকে এখানে আমরা মন বলে মেনে নিয়ে একথা বলতে পারি যে, মানুষের মনময় শরীর ও শরীরময় মন, যা একে অন্যকে বাহ্যিক ও আন্তরিক পরিস্থিতির প্রভাবে প্রভাবিত করে জাগতিক পারিপার্শ্বিক কারণে। এখানে মনোগত প্রভাব ও শরীরগত প্রভাব একই সাথে প্রভাবিত হয় তাদের কাঠামোগত নির্মাণের জন্য। অতএব, জীববিজ্ঞান আমাদের নারীর শরীরের বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে, যা তার বাস্তব অভিজ্ঞতাগত অবস্থানের অঙ্গ। কিন্তু জীববিজ্ঞান কোনো নারীকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। ‘নারী’ এখানে আভিধানিক শব্দ ও ‘নারীকে’ হল লাক্ষণিক শব্দ। অতএব, নারী এখানে নারীর লক্ষণের সাথে যুক্ত, যেখানে সে নিজের আবেগময় জীবনে নানান প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সমাজ ও পরিবারের সাথে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে। যেখানে নারীর মন সর্বদাই প্রভাবিত করে শরীরকে এবং শরীর প্রভাবিত করে মনকে। এভাবেই একে অন্যের কাছ থেকে নিষ্কৃতি না পেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই খুঁজে নেয় অন্য উপায়, যা প্রকৃতির ধর্ম। মন ও শরীর তখন একটা মাঝখানের বোঝাপড়াকে মেনে নিতে বাধ্য হয় পরিস্থিতির চাপে, যা তার মন ও শরীর দুয়ের পক্ষেই স্বাস্থ্যসম্মত। এর ফলেই একটা স্বাভাবিক লক্ষণযুক্ত মানুষের মধ্যেই দেখা দেয় কিছু প্রবণতা বা লক্ষণ, যা তাকে আলাদা করে আরো পাঁচটা স্বগোত্রের থেকে। এই লক্ষণ বা প্রবণতা কখনই

কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ মানুষের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি স্থির নয়। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি বিভিন্ন। প্রত্যেকটা মানুষ একে অন্যের থেকে ভিন্ন। তার জাগতিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও আলাদা এবং সময় ও কাল এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার প্রেক্ষিতে মনোবিজ্ঞান তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। অনবরত এই পরিস্থিতি ও সময় পরিবর্তনশীল, অতএব সিদ্ধান্তের সমীক্ষারও পরিবর্তন হতে বাধ্য। মনোবিজ্ঞান আমাদের একটা ধারণা অবশ্যই দিতে পারে, জীববিজ্ঞানের মতো যার থেকে আমাদের বিষয়ের ওপর একটা ধারণা হয়, এ বিষয়ের সম্ভাব্যতার কারণগুলো ধরতে পারি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না।

অন্যভাবে সার্ত্রে ও মার্লো পয়্যি মন্তব্য করেছেন; "যৌনতা অস্তিত্বের সঙ্গে সমব্যাপ্তিসম্পন্ন'—এই বিবৃতিটি বুঝতে পারা যাবে ঠিক দুটো বিভিন্ন উপায়ে; এটার অর্থ হতে পারে জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার একটা যৌন তাৎপর্য আছে, অথবা প্রতিটি যৌন ঘটনার একটা অস্তিত্ববাদমূলক গুরুত্ব আছে। এই দুটি বক্তব্যকে মেলান সম্ভব, তাছাড়াও যখনই 'যৌন'-কে জনন সম্বন্ধীয় থেকে আলাদা করা হয়, তখন যৌনতার ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হয় না।"

সিমন দ্য বোভোয়ার তাঁর 'স্ত্রীলিঙ্গ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে বলেছেন যে; যৌনতাত্ত্বিক ও মনোচিকিৎসকরা প্রায়ই একই রকম পর্যবেক্ষণকে প্রতিষ্ঠা করেন যে, নারী 'বিসমকামীদের' অধিকাংশই গঠনগতভাবে সম্পূর্ণ অন্য মেয়েদের মতোই। তাদের যৌনতা কোনোভাবেই তাদের শরীরস্থানীয় 'অদৃষ্ট' দ্বারা নির্ধারিত নয়। তাদের মতে, নারী সমকামী যুগলের একটি 'পুরুষালি' ও অন্যটি মেয়েলি' চেহারার হবে। বোভোয়ারের মতে; এর মতো ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। তিনি বলেছেন যে হারেমের অধিবাসিনীদের, বারাঙ্গনাদের, অত্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে 'মেয়েলি' নারীদের মধ্যে, অনেক সমকামী আছে; তেমনই আবার বহুসংখ্যক 'পুরুষালি' মেয়েরা অসমকামী। তাঁর মতে, শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, একথায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 'দুটি লিঙ্গের মধ্যে কঠোর কোনো জৈবিক পার্থক্য নেই; সদৃশ দেহ কিছু হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার ধারা-পুরুষত্বের বা নারীত্বের দিকে-জন্মগত প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত, কিন্তু ভ্রূণের বিকাশের সময় কম-বেশি দিক পরিবর্তন হতে পারে। কারণ তাদের পুরুষাঙ্গের বিকাশ বিলম্বিত হয়েছে; তাই আমরা দেখি যেসব মেয়ে পেশা হিসেবে খেলাধুলাকে বেছে নেয় তারা অনেক ক্ষেত্রে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়। লেখিকা, হেলেন ডয়েচ-এর, 'Psychology of women. vol. 1' থেকে কয়েকটি উদাহরণ এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন। যেমন—একটা তরুণীর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যে মেয়েটি একটি বিবাহিতা রমণীকে প্রেম নিবেদন করেছিল তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরে প্রকাশ পায় যে মেয়েটি উভলিঙ্গ এবং শল্য-চিকিৎসা করে তার অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে

পুরুষত্ব সম্পন্ন করার যে সে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন প্রেমিকাকে বিয়ে করতে ও শিশুলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই উদাহরণ কখনও এ-কথা প্রমাণ করতে পারে না যে প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে এরকম সম্ভাবনা থাকে। যে উভলিঙ্গের দুটি লিঙ্গেরই জননপ্রক্রিয়ার উপাদানগুলো রয়েছে, সে নারীসুলভ যৌনতা দেখাতে পারে। বোভোয়ার বলেছেন, তিনি এমন একজনকে চিনতেন যে দুঃখিত ছিল বিসমকামী বা সমকামী কাউকে অনুপ্রাণিত করতে অক্ষম হওয়ার জন্য। সে নিজে কেবল পুরুষ দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল।

পুরুষ হরমোনের প্রভাবে নারীতে পুরুষোচিত যৌনবৈশিষ্ট্য যেমন, মুখে চুল গজাতে পারে। আবার শিশুসুলভ নারীপ্রকৃতি, যা হরমোনের অপর্যাপ্ততার জন্য হয়। এইসব নারীরা কমবেশি সমকামী ঝোঁকের জন্ম দেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে হরমোন শুধু একটা পরিস্থিতি নির্ধারণ করে তার লক্ষ্যটি স্থির করে না, যা দিয়ে সম্পূর্ণ সমকামিতার পরিস্থিতিকে নির্ধারিত করা যায়। একটি উদাহরণ দিয়ে লেখিকা প্রমাণ করতে চেয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন তরুণী পোলিশ সৈনিক যে আহত হয়ে ডয়েচ্ শুশ্রূষার আওতায় এসেছিল এবং প্রকৃতপক্ষেই যার স্পষ্টত পুরুষোচিত যৌনবৈশিষ্ট্য ছিল। সে শুশ্রূষাকারিণী হয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় এবং তারপর তার লিঙ্গ গোপন করে একজন সৈনিক হয়েছিল। সে একজন সাথীর প্রেমে পড়ে এবং পরে সন্তোষজনক সমঝোতা করে নেয়। তার সাথীরা তাকে তার ব্যবহারজনিত কারণে পুরুষ সমকামী বলে মনে করত। কিন্তু বাস্তবে এটা ছিল তার নারীত্ব, যা তার পুরুষালি ভাবভঙ্গি সত্ত্বেও নিজেকে প্রবলভাবে প্রতিপন্ন করত। এই ঘটনাটা বুঝিয়ে দেয় যে একটি নারী পুরুষালি বৈশিষ্ট্যসহ আবশ্যিকভাবে সমকামিতায় ভাগ্যনির্দিষ্ট নয়। আবার এ-ও দেখা গেছে যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শরীরবৃত্তিসম্পন্ন নারীতেও কখনও কখনও 'ভগাঙ্কুর' ও 'যোনিগত' কারণে প্রকৃতি-প্রভেদ হয়ে থাকে। যেহেতু দেখা গেছে যে শৈশবের যৌনকামনাই 'ভগাঙ্কুর' সম্বন্ধীয়। অতএব নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না যে এই লক্ষণ পরিণত তরুণীর ক্ষেত্রে কোন দিকে বাঁক নেবে। যে ক্ষেত্রে এই ভগাঙ্কুরজনিত যৌনতাই নির্দিষ্ট থেকে যায়, সেখানে সমকামিতার সম্ভাবনাকে নির্দিষ্ট বলে ধরা হয়।

আবার অন্যদিকে আমরা দেখি কিছু মানসিক প্রবণতা যেমন; জড়িয়ে ধরা, দখলদারি ইত্যাদি প্রবণতা যদি নারীর মধ্যে বিশেষভাবে শক্তিশালী থেকে যায়, তাহলে তাকে এই স্বভাব অনেক সময় সমকামিতার দিকে চালিত করে। অথবা এই ধরনের প্রবণতামুক্ত নারীরা সেই সব পুরুষদের পছন্দ করে, যাদের অন্য মেয়েদের মতো করে ব্যবহার করতে পারবে। কিছু মহিলা আছে, যারা তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরদের এমনকি শিশুদের গায়ে হাত বোলাতে ভালোবাসে এবং বয়োপ্রাপ্ত পুরুষদের এড়িয়ে চলে। আবার দেখা গেছে বহু নারী আছে, যারা কৈশোরের পর পুরুষের বাহুবন্ধনে একটি শরীর হয়ে উঠতে চায়। অতএব, এই প্রবণতা ততটা জীববিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় না, যতটা মনোবিজ্ঞানের সাথে এর যোগ আছে বলে মনে হয়। কাজেই নারী নিজের মধ্যেই দ্বিধাবিভক্ত।

নারীর যৌনতা ও কামোত্তেজনামূলক সমস্যাগুলো যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তার মধ্যে ভগাঙ্কুরজনিত যৌন সুখানুভূতি ও বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিছু উত্তেজনা সঞ্চারক এলাকা (erogenous zone) শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিকাশ লাভ করে যোনিদেশে সংবেদন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে।

ফ্রয়েড এই নারীর ভগাঙ্কুরজনিত যৌনতাকে বলেছেন যে, নারীর যৌনসুখ পুরুষের মতোই কামশক্তি (libidi) আত্মরতির পর্যায়ের মধ্য দিয়েই বিষয়ভূত (objective) হয় পুরুষের অভিমুখে এবং ভগাঙ্কুর পর্যায়ের সুখানুভব থেকে যৌন পর্যায়ে পৌছায়। অতএব এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া বা যৌন বিবর্তনের পরিণতিতে না পৌছলে, শিশুসুলভ স্তরে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ভবিষ্যতে স্নায়ুবিকারের প্রবণতা বহন করে।

বিপরীতে তিনি বলেন, একটি পুরুষের কামোত্তেজনা (erolism) নিশ্চিতভাবে শিশ্নতে অবস্থিত। বালক যখন জননেন্দ্রিয়ের পর্যায়ে পৌছায়, তখন তার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়, যখন সে স্বকাম উত্তেজনার প্রবণতা থেকে ভিন্ন-রতি (hetero-erotic) প্রবণতায় চলে যায়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কিছু প্রবণতা, যা তাকে সাধারণত কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা বয়ঃসন্ধির সময় আত্মরতির মধ্য দিয়েই ঘটে। কিন্তু শৈশবের মতোই তার কামোত্তেজনার নির্দিষ্ট অঙ্গ—শিশ্নটিই থাকবে। এই সম্পূর্ণ যৌনপ্রক্রিয়াটাতে ফ্রয়েড পুরুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নারীকে তিনি বিষয় ও পুরুষকে বিষয়ী করে দেখিয়েছেন।

বোভোয়ারের মতে, এসব কারণ কোনো স্থির অদৃষ্ট স্থাপন করে না— লিঙ্গ যা কিছু অর্জন করার করে, তার কারণ এ একটা কর্তৃত্বের প্রতীক, যা অন্য জায়গাগুলোতেও প্রযুক্ত হয়। কিছু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এখনও আছে, যেখানে মেয়েরাই কর্তৃত্বের চাবিটা নিজেদের অধিকারে রাখে, যেখানে শিশ্ন তার গৌরব হারায়।

অতএব, নারী তার নারীত্ব অর্জন করে এমন কিছু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, যা সেই সমাজের ওপর নির্ভরশীল, যে সমাজের সে নিজেও একজন সদস্য। মনঃসমীক্ষকরাও একথা স্বীকার করেন যে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে থেকেই তার মনের অবচেতন জগৎ তৈরি হয়। যেখানে সে নিজের ভেতরে প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু জীবন জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং ব্যক্তি নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে তার নিজের পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যে দিয়ে তার নিজস্ব নির্বাচনগুলোকে সম্পন্ন করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানবিক অনুভূতির উপলব্ধিগুলোকে কোনো ক্রমেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। সেখানে আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতাকেই প্রাধান্য দিয়ে হয় কোনো বিষয়কে যথাযথভাবে বোঝার জন্য। যেখানে জীববিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব ও সমাজ সমস্তটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি নারীর ক্ষেত্রে কোনোটাই সহজ নয়। যেমন নারী তার কুমারী অবস্থা থেকে যুবতী অবস্থায় পদার্পণ করার মধ্য দিয়ে তার সহজ মানবিক সত্তা থেকে স্ত্রীলিঙ্গ সত্তায় নিজেকে বুঝতে শুরু করে। তার যৌনতা, মন ও তার সামাজিক

অবস্থানকে, যা তার পক্ষে তার পূর্ব বাল্য অবস্থার থেকে মোটেও কোনো অংশে সুখের হয় না। তরুণীর মানবিক সত্তা প্রতি পদে দ্বিধান্বিত হতে থাকে। তার ফলে সে নিজের কাছে নিজের পরিচয় খোঁজে। নারী সবসময়েই সক্রিয় ব্যক্তি হিসেবে হতাশ হয়, সে তখন পুরুষকে ঈর্ষা করে তার পুরুষাঙ্গের জন্য নয়, নিজেকে পুরুষের শিকার মনে করে। তার ফলে অনেক নারীর মধ্যেই কমবেশি লক্ষণীয়ভাবে সমকামিতার দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। তখন তারা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে তাদের যৌন সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে ইচ্ছুক থাকে না।

এইভাবেই নারীর ব্যক্তিগত জীবনের অন্দরমহলের আবহাওয়া ও তাদের বহির্জগতের অস্তিত্ব পুরুষোচিত স্বাধীনতার মধ্যে বৈপরীত্যের থেকে উদ্ভব হয় সমকামিতার প্রবণতা। এই প্রবণতাকে প্রভাবিত করে যে শরীরগত শর্ত, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক পরিস্থিতি, তারা কোনোটাই এর সঠিক নির্ধারক উপাদান নয়। তথাপি এগুলো বাদ দিয়ে আমরা কখনই এর মূলে প্রবেশ করতে পারব না। এটি একটি ভিন্ন অভিরুচি বা উপায়, যার মধ্য দিয়ে নারী তার সাধারণ অবস্থার সমস্যা ও বিশেষত যৌন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান করে।

পুরুষের দেহে এক বাড়তি প্রত্যঙ্গ
দিয়েছে শাশ্বত শক্তি, পৃথিবীর মালিকানা তাকে
ফ্রয়েডবাবুর মতে ওটি নেই বলে নারী হীনমন্য থাকে
পায়ের তলায় থেকে ঈর্ষা করে পৌরুষের প্রতি

.....

এই দয়া কে চেয়েছে। চিত্রাঙ্গদা! জোন অব আর্ক!
সিমন দ্য বোভোয়ার না শ্যামল দ্রৌপদী!

— ভুল্লকা সেনগুপ্ত

‘দুটি মেয়ের পারস্পরিক মানসিক নির্ভরতা’

নারী-মনস্তাত্ত্বিকরা লক্ষ করেছেন যে; “নারী-মনস্তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এন্ডোক্রাইন ক্ষরণ ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একটি পারস্পরিক ক্রিয়া থাকে। একটি নারীর দেহ, বিশেষত একটি তরুণী দেহ—একটি ‘হিস্টিরিক্যাল’ দেহ বলতে গেলে এই অর্থে যে আত্মিক জীবন ও সেটার শরীরবৃত্তীয় উপলব্ধির মধ্যে কোনো ফারাক নেই। বয়ঃসন্ধির গোলমালগুলো আরও খারাপ হয়ে ওঠে, যখন তাদের আবিষ্কার তরুণী মেয়েটির ওপর বিপর্যয়কারী প্রতিক্রিয়া আনে। যেহেতু তার দেহ তার কাছে সন্দেহজনক মনে হয় এবং যেহেতু সে শঙ্কিতভাবে এটাকে দেখে, তাই তার কাছে এটা অসুখ মনে হয়;... এটা অধিকাংশত নারী হওয়ার উদ্বেগ, যা নারীসুলভ দেহটাকে বিধ্বস্ত করে।” (স্ত্রীলিঙ্গ/ দ্বিতীয় খণ্ড/ সিমন দ্য বোভোয়ার/ পৃ. ৭৬)

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত থেকে আমরা একটি ধারণায় আসতে পারি, যখন একটি মেয়ে শৈশবে মায়ের প্রাধান্যতা থেকে বেরিয়ে তরুণী হয়ে ওঠে, তখন সে তার মায়ের অধীনতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে চায় ও তার তারুণ্যের পূর্ণতাকে বাইরের জগতে উপলব্ধি করতে উৎসাহ পায়। ফলে সে অন্যের চেতনায় থাকার প্রয়োজন বোধ করে এবং প্রায়ই দেখা যায় যে এই উৎসাহ ও সাহায্য সে তার বান্ধবীদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে এবং বান্ধবীরা তাকে তার যৌনতার বিষয়ে বিভিন্ন নতুন তথ্য জানার বিষয়ে সাহায্য করে। বান্ধবীদের কাছে তার নারীদেহ তাকে শঙ্কিত করে না। কারণ শৈশব থেকেই তার বোনেদের সঙ্গে ও মায়ের সঙ্গে তার একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়। যাতে স্নেহ ভালোবাসা সূক্ষ্মভাবে যৌন অনুভূতিতে রঞ্জিত থাকে। এই সময় দুটি বান্ধবী একে অন্যকে পৃথক বলে ভাবে না ও তাদের অহং সীমা ছাড়িয়ে যায় না। এভাবে পরস্পর-পরস্পরের কাছে এক প্রকার মানসিক আশ্রয় পায়, যা তাদের দুজনকেই নিজের নিজের কাছে আত্মমর্যাদা দেয়। এর ফলে একটি মেয়ে তার বান্ধবীর কাছে নিজের নগ্নদেহ দেখায়, নিজের স্তনের তুলনা করে। যা আমরা বোর্ডিং স্কুল, মেয়েদের হোস্টেল, বেশ্যালয় ইত্যাদি জায়গাগুলোতে প্রায়ই দেখতে পাই। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবে বোনদের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো খোলাখুলিভাবে হয়ে থাকে। তারা সুস্পষ্টভাবে আদর-সোহাগ বিনিময় পর্যন্ত করে থাকে সেখানে যৌনতার তুলনায়—সমপ্রেম-ই বেশি লক্ষিত হয়। বয়ঃসন্ধিতে একটা তরুণীর কাছে তার সুন্দর সুডৌল শরীরটা গর্বের ও ভালোবাসার হয়ে ওঠে। সে নিজেকে ভালোবাসতে শুরু করে কিন্তু এই ভালোবাসার মধ্যে তখন কামজ তাগিদ থাকে না, কিন্তু বয়ঃসন্ধি উত্তীর্ণ হওয়ার পর এই আত্মপ্রেম তাকে যৌন পরিণতি লাভের অভিমুখে চালিত করে। তাই বয়ঃসন্ধি মেয়েদের কাছে এত সমস্যাসঙ্কুল ও নির্ধারক মুহূর্ত।

রোজামন্ড্ লেমান্ (Rosamond Lehmann) তাঁর ডাস্টি অ্যান্সার (Dusty Answer)- এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে প্রায় সমস্ত তরুণী মেয়েদের মধ্যে সমকাম প্রবণতা আছে। যে প্রবণতা কদাচিৎ আত্মরতিমূলক উপভোগ থেকে পৃথক করা যায়। যাকে সমকাম না বলে সমপ্রেম বলায় কোনো বাধা নেই বলে মনে করি। তবুও তাদের মধ্যে 'বিশুদ্ধ-বন্ধুত্ব' গড়ে ওঠে, এবং তা অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে দৈহিক স্তরেও থেকে যায়। বয়ঃসন্ধিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে এই ব্যবহার বা আচরণগুলো বান্ধবীদের নিজের মধ্যে নিজের নিজের মনের ভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে ও গোপন কথা আদান-প্রদানে বিশেষ স্থান রাখে। তারা নিজেদের আবেগপূর্ণ মুহূর্তে একে অন্যকে অবলম্বন দেয়। এই পরিস্থিতিতে তারা যৌন আলিঙ্গনের পরিবর্তে নিজেদের ভালোবাসার নিষ্ঠাকে কোনো বস্তু বিনিময় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। অনেক মেয়েকে দেখেছি তারা বন্ধুত্বে বিশেষ 'নাম' ব্যবহার করে এবং সেই নামে তারা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে থাকে।

অতএব আমরা বলতে পারি, একটি মেয়ের আত্মজীবন ও তার শরীরবৃত্ত—এই দুটি আলাদা নয়, পরস্পর সম্পৃক্ত। স্বভাবতই মেয়েটি তার মানবিক অনুভূতিগুলোকে উপভোগ ও বুঝতে চেষ্টা করে। নিজের মধ্যে দিয়েই তাই তাদের মধ্যে আত্মপ্রেমের প্রকাশ ঘটে এবং পরে তা সমলিঙ্গের মধ্যে দেখে বুঝে তারা তৃপ্তি পায়। বাইরের পুরুষতান্ত্রিক জগৎ যেখানে তাদের কখনোই পুরুষের সমান হতে দেওয়া হয় না। সেই বাস্তব তাদের অন্তর্মুখী করে বা অস্তিত্বের বাস্তবতাগুলোর মুখোমুখি হতে তারা ভয় পায়। তখন তরুণী মেয়েটি নিজের চেনা ও ভরসার জগতের দিকে তার আশ্রয় খোঁজে, ঠিক যেমন শৈশবে সে তার মায়ের কাছ থেকে, বোনের কাছ থেকে পেয়ে অভ্যস্ত। এভাবে একটি মেয়ে আরেকটি মেয়ের মানসিক আশ্রয় হয়ে ওঠে।

'নরেতে-নারীতে প্রেম
শাস্ত্রে লিখা আছে।
নারীতে-নারীতে প্রেম
সখিত্ব হয়েছে।
নরতে নরতে প্রেম
সখা নাম পেল।
হে সখা হৃদয়ে রহো।
হৃদি দগ্ধ হল।"
(চাঁদের গায়ে চাঁদ, পৃ. ১৪৬)

তৃতীয় অধ্যায়

সমালোচনা : 'বামাবোধিনী'ও 'অভিজ্ঞান'

লেখিকা : নবনীতা দেবসেন

এই অধ্যায়টি লেখিকা নবনীতা দেবসেনের দুটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস 'বামাবোধিনী' ও 'অভিজ্ঞান'-কে কেন্দ্র করে। উপন্যাস দুটির একটা অন্যটার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করেছে। 'বামাবোধিনী'র চরিত্ররাই অনেকে জীবনের বিভিন্ন স্তরের দ্বন্দ্বকে দিনবদলের অভিজ্ঞতায় জারিত করে উত্তীর্ণ হয়েছে নতুন জীবন বোধে 'অভিজ্ঞানে' এসে। বামাবোধিনীর (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭) যে চরিত্রদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তাদের অনেকেই আবার ফিরে এসেছে পরিণত জীবনে নতুন অন্তর্দ্বন্দ্বের মোকাবিলায়। 'বামাবোধিনী'-র কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নারীর অন্তরাত্মা। ষোলো শতকের ময়মনসিংহের এক মহিলা কবির জীবনচরিত কীভাবে বয়ে এসেছে বিশ শতকের তিনটি মেয়ের জীবনবাহিনীর মধ্য দিয়ে। এখানে স্থানকালের দূরত্বকে অবলীলায় অতিক্রম করে গেছে মানবিক জীবনবোধের অভিজ্ঞতা। জীবনের অনেকগুলো কঠিন বাস্তবিক জটিলতাকে লেখিকা ধরা ও ছোঁয়ার নিপুণ প্রচেষ্টা করেছেন। মানবিক আবেগের সব বিপজ্জনক বিষয়ই অনায়াস দক্ষতার সাথে স্পর্শ করেছেন। লেখিকা নিজেই প্রস্তাবনায় লিখেছেন যে, "এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং নির্মাণপদ্ধতি দুটোই পরস্পর নির্ভর। পরস্পর সম্পৃক্ত। কাঠামো এখানে বক্তব্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ। সচরাচর বাংলা উপন্যাস যেভাবে লিখিত হয়, এটি সেভাবে লেখা হয়নি, এর গড়নপেটন আলাদা, চলন বলনও একটু অভ্যস্ত পরিধির বাইরে। জীবনের অনেকগুলো বাস্তব জটিলতাকে এখানে গভীরে ছুঁতে চেষ্টা করেছি। সমাধানের দায়িত্ব হয়তো নিতে পারিনি।"

এর পরে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়ের পরে 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে অনুভব করলেন কীভাবে দিনবদলের সাথে সাথে জটিলতর হচ্ছে আধুনিক জীবনের গতিপথ। কালের চাহিদা কীভাবে টান দিচ্ছে অভ্যস্ত আত্মপরিচয়ের ভিত্তিমূলে। আধুনিক নারীর জীবনের কয়েকটা বড়ো সমস্যাকে লেখিকা ধরতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে এবং এই সমস্যাগুলোর পরিচয়ের পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন তার সমাধানের, যা তিনি

পূর্বলিখিত উপন্যাস 'বামাবোধিনী'তে দিতে পেরেছেন কি না, সে বিষয়ে নিজেই দ্বিধামুক্ত ছিলেন না। উক্ত উপন্যাসে নারী সমস্ত সংস্কার ও সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে নিজের প্রকৃতিকে চিনে নিতে পেরেছে। যেখানে তাকে এই নির্ণয়ের পথে অবলম্বন দিয়েছে তার অভিভাবক, বন্ধু ও সমাজ। এখানেই লেখিকার কাছে পাঠক এক নতুন মূল্যবোধের স্বীকৃতি পেয়েছে, যা আধুনিক সমস্যাকে সমাধানের জন্য অপরিহার্য। যে সমস্যাকে 'বামাবোধিনী'তে অংশুমালা চিনতেই পারেনি। তার হঠাৎ আবির্ভাব তাকে বিহ্বল ও অসহায় করে দিয়েছিল, সেই অংশুমালাই 'অভিজ্ঞান'-এ এসে একই সমস্যাকে চিনে নিয়ে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে হলেও স্বীকৃতি দিয়েছিল।

'বামাবোধিনী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুই নারী অংশুমালা ও মালিনী এবং তাদের প্রেমিক রবি ও সঞ্জয়। সঞ্জু, রবি ও অংশুমালা ছোটবেলার তিন বন্ধু। রবি চিরকাল লাজুক ভালোমানুষ, সঞ্জয় হুল্লোড়ে আর অংশু কথা কম বলে। পাস করে দুই বন্ধু রবি ও সঞ্জু চলে যায় কানপুর আইআইটিতে, অংশু প্রেসিডেন্সিতে। কয়েক বছর কোনো যোগাযোগ ছিল না তাদের। কয়েক বছর পর যখন অংশুর সাথে রবির দেখা হল, তখন তারা দুজনেই চাকরি করে। রবিও আগের তুলনায় অনেক বদলে গেছিল। অংশুর বাবা মারা যাওয়ায় রবির সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়, যেন মাতৃস্নেহ রবি-অংশুকে ভুলিয়ে রেখেছিল।

সঞ্জয় আইআইটির পড়া শেষ করে পুনরায় কোনও কোর্স করতে যায় এবং সেখানে মালিনী সাঠে নামে এক মারাঠি মেয়ের সাথে সঞ্জুর প্রণয় ও শুভ পরিণয় হয়। সঞ্জু ও মালিনীর একটি মেয়ে হয়, যার নাম পুষ্পমালা।

অন্যদিকে রবি ও অংশুর ভালোবাসা যখন চরম পর্যায়ে, তখন হঠাৎ একদিন রবির একটি চিঠি অংশু পায়, যে চিঠিতে রবি অংশুকে বহু চেষ্টা করেছে এই কথা বোঝাবার যে, সে অংশুর একমাত্র বন্ধু, তাকে কোনো রকম কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা তার নেই। কিন্তু সে নিজে বুঝেছে যে, সে একজন সমকামী এবং তার আসল প্রেমিক সঞ্জয়, যাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। একমাত্র অংশুকেই সে মুখ ফুটে এ কথা বলার সাহস ও অধিকার বোধ করছে। রবি অংশুকে জানাতে বাধ্য হয়েছে। রবি জানে, এ কথা সমাজে প্রকাশ পেলে সে জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপহাসের, ঘৃণার ও সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়াবে। তবু সে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করতে বাধ্য, যেখানে সে অসহায়।

এইভাবে একদিন কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়ে পিতৃমাতৃহীন অংশুমালার শেষ ভালোবাসার অবলম্বনটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রকৃতির অমোঘ আঘাতে। সঞ্জয় ও মালিনীর ডিভোর্স হয়ে যায়। তখন তাদের মেয়ে পুষ্পা মালিনীর গর্ভে। সঞ্জয়–রবি–অংশু–মালিনী এদের চারজনের মধ্যে অংশু আর মালিনী দুটো পার্শ্ব চরিত্র। যারা কিছুই

বোঝেনি, কোনো সন্দেহ করেনি রবি ও সঞ্জয়কে, তবুও তাদের বিশ্বাস একদিন প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মানুষের সহজাত প্রকৃতিকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে নেই। তার প্রকাশকে কোনো ভাবেই চাপা দেওয়া যায় না। লেখিকা যেন সে কথাই বলার প্রয়াস করেছেন এখানে। অংশুর মনে হয়েছে তারা যেন, "প্রকৃতির বন্য আগুনকে চাপা দিয়ে রাখবার জন্য ব্যবহৃত সভ্যতার ছাই। দুটো ছাই মানুষ।" অংশুর মনে হয়েছ কথাটা যত সত্য বলে বর্তমানে মনে হচ্ছে, অতীতে এতটা সভ্যতা এর মধ্যে ছিল না। আসলে মানুষের নিজেকে চিনতেও যথেষ্ট সময় লাগে। কারণ আমরা প্রথমে অন্যের চোখে নিজের মুখ দেখতে শিখি। সমাজ যে আয়নাটা আমাদের দেয় আমরা তাতেই নিজের মুখ দেখতে অভ্যস্ত। ভুল-ঠিক বিচার না করেই আমরা সেটাকে মেনে নিই। অনেক দিনের সংঘর্ষের টানাপোড়েনের পর যখন বাস্তব জীবনের আনাচ-কানাচগুলো চিনে যাবার পরে, স্বামী হয়ে, বাবা হয়ে, শেষ পর্যন্ত সঞ্জয় যেমন চিনেছিল নিজের প্রকৃতি। যদিও সঞ্জয় ও রবি কলেজজীবনের পর ঠিক করেছিল 'স্ট্রেট লাইফ' কাটাবে, কিন্তু তা তারা শেষ পর্যন্ত পারেনি। তবে মালিনী ও অংশুর বন্ধুত্ব থেকে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

অংশুর সাথে মলয়ের শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে তাদের সংসারে আবির্ভাব ঘটে এক তেলেগু রমণী কমলাম্মার। লেখিকা উচ্চশিক্ষিতা অংশুর জীবনে নিয়ে আসে আর এক সত্যের অমোঘ আঘাত। মলয় প্রথম থেকেই চিনত নিজের প্রকৃতি। রবির মতো রঙিন কাচের আয়নায় ঢাকা ছিল না তার মুখ। মলয়ের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখিকা পাঠকের সামনে একটি দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি কোনো সংযম মানে না। সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের সব বিধি-নিয়মই ভঙ্গুর বলে মনে হয়। উক্ত বিষয়টাকে লেখিকা অন্তর্ঘাতের মধ্যে দিয়ে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। মলয় প্রথম থেকেই অংশুমালাকে বাধা দিয়েছে কমলাম্মাকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে। এখানে কমলাম্মাদের জীবনের একটা বীভৎস ছবি আমরা দেখতে পাই। স্থান-কাল-পাত্রই শুধু বদলে যায় সময়ের গতিতে। কিন্তু মানুষ তার প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি পায় না। বহু বছর পরেও মাইন্‌লা গ্রামের মনিববাড়ি থেকে আজ পর্যন্তের পথযাত্রায় কমলাম্মা বেশিদূরে পালাতে পারেনি। এখানে লেখিকা এক সুন্দর জীবনদর্শন দেখিয়েছেন, 'বাসা বদল করলেই কি সমস্যা বদল হবে? ভেতর থেকে তোমার নিজেকেই বদলে ফেলতে হবে, কমলাম্মা।"

"দিন যায় বৎসর যায় শতক উজায়
সীতা, চন্দ্রা, কমলাম্মা স্রোতে ভাইস্যা যায়।"

এই বদলে দেবার চেষ্টাই লেখিকা উপন্যাসের ঘটনার প্রবাহে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। যেখানে সমস্যা স্থির কিন্তু তার থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষের মধ্যেই

ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন আবশ্যক ও অনিবার্য।

অধ্যাপিকা অংশু তার বান্ধবী মালিনীকে এই দৃঢ় প্রত্যয় দেবার চেষ্টা করেছিল। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য; "মন শক্ত করো মালিনী, ভেঙে পড়ার মতন কিছুই হয়নি, যে শূন্যতাটা এই মুহূর্তে দেখা দিয়েছে, সেটা অন্ধকূপ নয়, ওটা একটা দীর্ঘ টানেল, ...এটা একটা গহন পথ। আমাদের অন্য কোথাও পৌঁছে দেবেই, অন্য কোথাও, নতুন একটা ঠিকানাতে।" সত্যিই অংশুমালার গভীর বন্ধুত্ব সেদিন মালিনীর জীবনে প্রয়োজন ছিল। ঠিক যেমন প্রয়োজন ছিল মালিনীকে অংশুমালার। তারা পরস্পর-পরস্পরকে বুঝতে পারত মানসিক স্তর থেকে। যদিও তাদের স্বভাবের কোথাও কোনো মিলের লেশমাত্র ছিল না। মালিনী ছিল পুরুষালি প্রকৃতির আর অংশুমালা ছিল শান্ত, স্বল্পভাষী; যাকে আমরা মেয়েলি প্রকৃতি বলে থাকি সেই স্বভাবের। তথাপি ভেতরে কোথায় যেন ওরা ছিল এক-আত্মা। কিন্তু এই ভালোবাসায় নেই কোথাও যৌনতার লক্ষণ, যা শুধুই মানসিক একাত্মতা। নারী মনের সমব্যথী আর একটা নারীর মন মিলে যে দুটি শরীরে এক আত্মার বাস। এক গভীর নির্ভরতা, যা একটি মেয়েই স্বচ্ছন্দে আরেকটি মেয়েকে দিতে পারে। আপাতভাবে শরীর এখানে কোনো অস্তিত্ব রাখে না। মনের ওপরেই থাকে সমস্ত দায়ভার। এখানে লেখিকা প্রচ্ছন্নভাবে লেসবিয়ান সম্ভাবনার লক্ষণের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেখানে সম্পর্কে শুধু মানসিক নির্ভরতা থাকে, কিন্তু দীর্ঘদিন যদি মেয়ে দুটি পুরুষসঙ্গ না-করে তবে এদের শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হবার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। এখানে লেখিকা লেসবিয়ান নারীদের একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রকে চেনাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সরাসরিভাবে নয়। এখানে যেন লেখিকা এ কথাই আকারে-ইঙ্গিতে বলেছেন যে পরিস্থিতিই সম্ভাবনার জননী, ভবিষ্যৎ এক্ষেত্রে সব সময় সুনির্দিষ্ট নয়।

সমগ্র উপন্যাসে, অংশু, মালিনী ও কমলাম্মা, এই তিন কন্যাকে জীবনের নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়েছেন, সেখানে রাজনীতির সাথে নৈতিকতার, প্রেমের সাথে দায়বদ্ধতার, পাণ্ডিত্যের সাথে সৃজনী প্রতিভার, পুরুষশাসিত নীতিবোধের সাথে জগতের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের, সামাজিক সুনীতির সঙ্গে মানবিক আবেগের সংঘর্ষে বিপর্যস্ত তিন কন্যা।

উক্ত উপন্যাসে লেখিকা বামাগণকে যেন শেষে একটা উপায় বলার চেষ্টা করেছেন—অংশুমালার পালার মধ্যে দিয়ে হে বামাগণ এই চিরাচরিত দুর্ভাগ্যকে উতরে যাবার একটা নিশ্চিত পথ হল বীণাপাণীর শরণাগত হওয়া, অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা স্বাবলম্বী হওয়া।

"সরস্বতী পূজা করি রামায়ণ গাই
সীতার কাহিনী মাগো বিশ্বেরে শুনাই

অন্তরেতে পুষ্করিণী সদাই টলমল
সেই জলে ফুটাও মাগো সোনার কলম”

“নারীর গহীন ঢেউ বাঁধে না ভাষায়
স্বপ্নের হাসন স্বপ্নের কাঁন্দন অংশুমালা গায়।
ও গঙ্গা বইয়া যাও ধীরে-”
(বামাবোধিনী)

এই স্রোতস্বিনী গঙ্গাই দুই বামাকে, অর্থাৎ মালিনী ও অংশুকে বোধের গহিন ঢেউয়ে ভাসিয়ে আনে ‘অভিজ্ঞান’-এ । কিছু পুরনো চরিত্র এসে মিলিত হয় কিছু নতুন চরিত্রের সাথে। সময়ের সাথে পাল্টে যায় নতুন প্রজন্মের বিচার-বুদ্ধি। একই সমস্যাকে কেন্দ্র করে নতুন সমাধান পাওয়া যায় এই পর্বে এসে। পূর্বে যে সমস্যার সমাধান বামাগণের পক্ষে সম্ভব হয়নি, নিয়তির পরিহাস বলে মেনে নিতে হয়েছিল সবই। এই পর্বে এসে তার সমাধান সম্ভব হল, প্রায় দীর্ঘ এক দশকের পথ-যাত্রায়।

‘অভিজ্ঞান’-এর মূল চরিত্র ‘বামাবোধিনী’-র মালিনীর মেয়ে পুষ্পাঞ্জলি। এখানে তার প্রথম জীবনের প্রেমিক সৌম্য এবং পরবর্তীকালে ‘সলমা’। এদের নিয়েই মূলত উপন্যাসের কাহিনীর বুনট। সৌম্য-পুষ্পার ভালোবাসায় হঠাৎ চিড় ধরে, আর সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে যায় সলমা, যে একজন চাকরিরতা বিবাহিতা নারী এবং পুষ্পা থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। সৌম্য পুষ্পার এই পরিবর্তন ধরতে পারে এবং তার কারণ সনাক্ত করে ফেলে, যা বামাবোধিনীতে অংশুমালা করতে পারেনি। অনেক লক্ষণ দেখা যাওয়া সত্ত্বেও রবি ও সঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠতাকে তারা সংস্কারের চোখ দিয়ে সনাক্ত করতে পারেনি। এখানে আমরা দুই প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই। গত প্রজন্ম সংস্কারবশত ভাবতেই পারেনি দুটো পুরুষের যে কোনো বয়সে বা যে কোনো পরিস্থিতিতেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে কোনো নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা নিহিত থাকতে পারে। অথচ নতুন প্রজন্মের সৌম্য কত সহজেই এই বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে—পুষ্পা কেন বদলে যাচ্ছে আচার-আচরণে। এই পরিবর্তনে সৌম্য পুষ্পাকে পাগলের মতো ভালোবাসা সত্ত্বেও অংশুমালার মতো ভেঙে পড়ছে না। অতি সহজেই সে এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেছে পবিত্র অন্তঃকরণে। কারণ তার জানা ছিল মানুষের প্রবণতাকে লঙ্ঘন করা যায় না, প্রকৃতিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা মানুষের নেই। সেখানে যা স্বাভাবিক তাকে মেনে নেওয়াতেই জীবন স্বাভাবিক ছন্দে চলতে পারে। সেখানে কোনো মেকি সংস্কারের সঙ্গে মূল্যবোধের ন্যায়নীতির দ্বন্দ্ব নেই। আছে সুসংহত যুক্তিসাপেক্ষ সমাধান। এখানে সংস্কারকে উড়িয়ে দিয়ে লেখিকা এনেছেন জ্ঞানের আলোক, যে আলোতে যা দেখা যায় সবই স্পষ্ট। তাই সমস্যা যতই জটিল

হোক-না কেন, সমাধান তার সহজসাধ্য। পুষ্পা নিজের প্রকৃতি না জানলেও কোনো সমস্যা নেই। সৌম্য তাকে সযত্নে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সমস্যা সমাধানের জন্য। পুষ্পা যখন নিজের প্রবৃত্তি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত, সৌম্য তাকে বলেছে "আসলে অনেক মানুষই বাইসেক্সুয়াল হয়, সেটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। পুষি, আমার মনে হয় তুই-ও বাইসেক্সুয়াল। আমাকেও খুব ভালোবাসিস, আই নো উই হ্যাভ আ গ্রেট টাইম ইন বেড, কিন্তু আমাদের তো বাল্যপ্রেম মিইয়ে যাচ্ছে। এটা নতুন, খুব রোমান্টিক, এতে নতুন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডেড হয়েছে, ... নতুন নতুন ডিসকভারি থাকতে পারে, গিল্ট আছে, ... মোট কথা এইসবে প্রচুর উত্তেজনা আছে..."

অথচ বামাবোধিনীতে এ কথাই বলতে রবি কতই-না ধান ভাঙতে শিবের গীত গেয়েছে। দুঃখ করেছে অদৃষ্টকে দোহাই দিয়ে নিজেকে নিজের নজরে ছোট করেছে। প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করতে গিয়ে নিজেকে তার কত করুণার পাত্র বলে মনে হয়েছে অংশুর কাছে, সমাজের কাছে। অন্যদিকে সঞ্জয় মালিনী ও পুষ্পাকে মাঝপথে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রবির ডাকে সাড়া দিয়েছে। সেদিক থেকে সঞ্জয়কে রবির তুলনায় কিছুটা দৃঢ় বলা যেতে পারে। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত সঞ্জয় টিকে থাকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বাস্তবের পটভূমিতে। এখানেই কালোত্তীর্ণ হয়েছে উপন্যাসের প্লট।

কীভাবে দুটি মেয়ে সমকামী হয়ে ওঠে, পরিস্থিতি, পরিবেশ ও জিনগত প্রবণতা থেকে তার একটা পর্যায়ক্রম পরিলক্ষিত কাহিনীর বুনটে। এই নতুন প্রজন্ম যৌনতার সমস্ত বিভাগের সাথে পরিচিত। এখানে পুরুষকে আর দেখা যাচ্ছে না, নারীকে সৃষ্টির যন্ত্র করে ব্যবহার করতে। পুষ্পাকে সৌম্য সহজাত প্রকৃতি অনুসারে যৌনসুখ ভোগের সমান অধিকার দিচ্ছে মর্যাদার সাথে। দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন অথচ কোথাও পুরুষ বা নারীবিরোধী হুংকার নেই। নেই কোনো অহং-এর দ্বন্দ্ব। বরং সৌমের মুখে আমরা শুনতে পাই, "পুষ্পা ইজ ওনজি অ্যানাদার ওয়ে ওফ লুকিং অ্যাট লাভ। এই তো! নাথিং আনন্যাচারাল ইন ইট। আমাদের মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যেও আছে।" সৌম্য এ কথা জানে যে, আবার এই ছক পাল্টে যেতে পারে! সব সময় সেক্স আইডেনটিটি স্থায়ী হয় না। তাতে অসম্ভবতা কিছুই নেই। "ফেসিং দ্য মিরর" পড়ে দেখো প্রথম কথাই হল নিজেকে চেনা, নিজের সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সটাকে চেনা, এবং তাকে স্বীকার করে নেওয়া। সমাজ হয়তো স্বীকৃতি দেবে না। কিন্তু তুমি নিজের মনের মধ্যে কোনও দোটানা রেখো না, "ইউ মাস্ট নো হু ইউ আর, অ্যান্ড হোয়াই সেক্স ইউ হ্যাপি। ইটস ইয়োর লাইফ, পুষিবেবি। ডোন্ট বিলিভ ইওরসেল্‌ফ।"

সমস্ত সমস্যার উৎসকে লেখিকা এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন নতুন প্রজন্মের হাত ধরে। এখানে আর পুষ্পাকে কোনো অন্ধকার টানেল দিয়ে অজানা পথে যাত্রার

ঝুঁকি বহন করতে হয়নি। তার মায়ের মতো বা অংশুমালার মতো। তার বাল্যবন্ধু সৌম্যই তাকে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে এগিয়ে দিয়েছে।

অথচ একই স্থান-কালে পুষ্পা যত সহজে সমস্যার থেকে সমাধান খুঁজে পাচ্ছে, অংশুমালা তা পাচ্ছে না। 'দলিত সম্প্রদায়', নারী-জাগরণ, 'গে-রাইটস', আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রতিবাদ, এই সমস্ত সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে কালি-কলমের যুদ্ধ করার দরুন তাকে প্রতিদিন বিভিন্নভাবে অপমানিত হতে হচ্ছে পদে পদে। "সাত ঘাটের জলখাওয়া মেয়েছেলে! ও মোটেই মনুষ্য পদবাচ্য নয়, ওই কুক্কুরীটাকে একদিন রাস্তায় কড়কে দিলেই হবে," এরা আঘাত করতে চায় নারীর মননকে কিন্তু মূল লক্ষ্য নারীর শরীর। "প্রস্টিটিউটদের ভার্জিনিটি আর মালা দেবীর ইন্টেলেকচুয়াল এবিলিটি একই বস্তু" নারীর শরীরকে তুলেই এসব নীচ অপমানজনক উক্তিগুলো সম্ভব। পাশাপাশি দুটো সামাজিক মস্তিষ্কবোধকে এখানে একইভাবে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যাতে পাঠক বুঝতে পারে সমস্যার উৎপত্তি কোথায় এবং নিষ্পত্তি কোথায়। সংস্কারের মহীরুহের শিকড় যতক্ষণ-না নির্মূল করা যাবে, শুধুই ডালপালা কেটে তার উচ্ছেদ করা যায় না। তাই দুটো ধারাকে একখাতে প্রবাহিত করতে হয়েছে খুব সম্ভবত।

উপন্যাসে অংশুর এক অতি প্রিয় চরিত্র অদ্যাবধি আলোচনা করা হয়নি, যদিও সে প্রথম থেকেই আছে অংশুমালার সাথে বন্ধুর মতো, অভিভাবকদের মতো। তিনি হলেন ওয়েন্ডি, এক বিদেশিনী অবসরপ্রাপ্ত মহিলা। প্রত্যেক দিনই যে জীবনের কাছে নতুন-নতুন উপহার পায়, কিংবা অংশুর কথায় ছিনিয়ে নেয়। জ্ঞান, বোধ আহরণের মধ্যে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ষাট বছরের হৃদয়েও তার জীবন বিষয়ে আগ্রহের জোয়ার বয়ে চলেছে। মালা ওয়েন্ডিকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে, মহোল্লাসে গবেষণা চালিয়ে এই সত্তর বছর বয়সে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি সংগ্রহ করেছেন। নারীমনের ভেতরের এবং বাইরের, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি করা অনেকগুলো গতানুগতিক-বিঘ্ন তিনি অনায়াসেই, আপন মনে, লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে গেছেন বলে একবারও মনে করেননি, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এমনকি, নারীবাদী বলেও ভাবতে চেষ্টা করেননি ওয়েন্ডি। এই ওয়েন্ডি চরিত্রটিকে যেন পাশ্চাত্যের মুক্তমনের নারীর প্রতীক হিসেবে উপন্যাসে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যার কাছ থেকে প্রাচ্যের নারী দীক্ষিত হবে আত্মোপলব্ধির মন্ত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দীক্ষায়। আজকের ভারতীয়রা পাশ্চাত্যকে পদে-পদে অনুকরণ করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। লেখিকাও এই সুবিধাকে সুযোগ দেবার চেষ্টা করেছেন ওয়েন্ডির মধ্যে দিয়ে, যদি কিছু শুভবুদ্ধি প্রাচ্যের বামাদিগের মনে প্রবেশ করানো যায় বিদেশি মোড়কে।

এভাবে উপন্যাসের প্লট মজবুত করেছে বিষয়ের তাৎপর্যকে। যেখানে শেষ পর্যন্ত

পুষ্পা বুঝে নিতে পেরেছে তার আত্মার সহজ প্রকৃতিকে। যেখানে সে তার বাবার জিনবাহিত প্রবণতা থেকে মুক্তি পায়নি। কিন্তু সে এর কারণে কাউকে দোষারোপ করেনি। যেমন করেছে তার মা মালিনী। পুষ্পা বাবাকে বুঝেছিল খুব সহজভাবেই, "বাবা ওয়াজ হেল্পলেস। হি হ্যাড টু মেক আ চয়েস। আই ক্যান কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ প্রবলেম। পুয়র গাই। বিকস লাভ ইজ ব্লাইন্ড।" যে কথায় আজও অংশুমালার শিরদাঁড়া দিয়ে হিমপ্রবাহ নেমে যায়। কুড়ি-বাইশ বছর আগে যেমন নেমেছিল। লিবারেল থিংকিং সমাজসংস্কারক লেখিকা উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির নারী হয়েও। এখানে অংশুমালা চিরন্তন সংস্কার থেকে আজও রক্ষা পায়নি। তার বাইরের চিন্তার প্রকাশ ও অন্তরের কথায় তফাৎ বিস্তর। আত্মিকভাবে সে আজও আরো পাঁচটা সাধারণ মানুষের ভাবনা দিয়েই ভাবে। পুষ্পার ভবিষ্যতের অজানা আশঙ্কায় তার শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। সে ভাবে "পুষ্পা কী করে লেসবিয়ান হল? এ লক্ষণ তার ছোটবেলায় ছিল না। তবে কি সত্যিই জিন-এর মধ্যে ভরা থাকে? যোনিতে সঞ্চারিত পৈতৃক উত্তরাধিকার? পুষুকে লেসবিয়ান হতে দেওয়া যায় না। ওর জন্য সুস্থ স্বাভাবিক পারিবারিক সুখের বন্দোবস্ত করা দরকার। এ জিনিস চলতে পারে না।" এখানে কোথাও আমরা অংশুমালার লিবারেল বা 'ফ্রি' থিংকিং শুনতে পাই না, যা তার বাইরের পরিচয়। মানুষের মনের এই সূক্ষ্ম টানাপোড়েন এতদিন অন্যের হয়ে যে কথা অংশুমালা উচিত বলে ন্যায়সঙ্গত বলে ভেবে এসেছে আজ কন্যাস্নেহে পালন করা পুষ্পার ক্ষেত্রে সেই ভাবনাগুলো পথ আটকাচ্ছে চিরন্তনের কাছে। লেখিকা অংশুর মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষের চিরন্তন সংস্কার, যা অবচেতন মনে থেকে যায় তাকে ছাপিয়ে আমাদের বাস্তবের প্রসূত চিন্তাকে অনুরণ করা ও যথার্থতা দেওয়ার মধ্যে এখনও অনেক ব্যবধান রয়েছে। আমরা মুখে অনেক সময় অনেক কথাই বলে থাকি বা মনেও অনেক বিষয় ভেবে থাকি কিন্তু সময়মতো সে ভাবনা-চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না। অংশু 'গে-রাইটস' নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করে, অথচ এখনও ভাবে "সমকাম, সমপ্রেম এক কথা নয়। আদালতের ভাষায় 'সেকশন ৩৭৭', 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক আচরণ'। নিজের অজান্তেই নিজেকে ছিঃ ছিঃ করে ধিক্কার দিয়ে ওঠে। 'ওয়েন্ডি' তাকে পশ্চিমের মন দিয়ে, চোখ দিয়ে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করে, "লেসবিয়ান আর হিউম্যান, দে আর উইমেন, জাস্ট দ্যান মেন, হু নোজ, দে মে বি বেটার লাভার্স টু? আমাদের তো খুশি হওয়া উচিত, অংশু, যে পুষ্পা জানে ও কী চায়। সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সের প্রধান প্রবলেম আমরা তো বেশিরভাগ সময়েই জানতে পারি না, আমরা আসলে কী চাই। কাম অন, পুষ্পা ইউ শি নাইস?" সঞ্জয় পুষ্পাকে বোঝায়, "মানুষ মানুষের প্রেমে পড়ে, কোনো সেক্সের প্রেমে পড়ে না সবসময়ে। আমি তোমার মায়ের প্রেমে পড়েই মালিনীকে বিয়ে করেছিলাম, তুমি সেই প্রেমেরই ফসল। আবার আমি রবির প্রেমে পড়েই তোমাদের ছেড়ে চলে গেলুম, কারণ তখন সেটাই ছিল আমার অনেস্ট

অ্যাটাচমেন্ট।" (অভিজ্ঞান) এ কথাগুলো বলার পেছনে সঞ্জয় মেয়েকে অভিভাবক ও শুভচিন্তক হিসেবে এর নেগেটিভ দিকটাকে জানাবার চেষ্টা করেছে যে আমাদের দেশে 'ইটস অ্যা হার্ড চয়েস, ইটস অ্যা হার্ড লাইফ।' "ইউ ক্যান অলওয়েজ হ্যাভ অ্যা গার্ল ফ্রেন্ড এনিওয়ে, কেউ কিছু মাইন্ড করবে না, বাট ডু নট সেটল ফর আ সেম। সেক্স রিলেশনশিপ ওপেনলি। সোশ্যালি ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। ইউ ট্রায়েড, বাট ইউ ফেলড।"

এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে আজও এই সম্পর্কের খোলাখুলি আত্মপ্রকাশে কত বাধা। যতই আমরা নিজেদের পাশ্চাত্য ভাবনার আধুনিক সভ্যতার কর্ণধার ভাবি-না কেন, আসলে মানসিক সংস্কার আজও আমাদের ষোড়শ শতাব্দীর চন্দ্রাবতীর যুগেই আটকে আছে। সেখানে আমরা কোনো নতুন ভাবনার প্রকাশকেই রন্ধ্রপথেও প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ। এখানে দেখানো হয়েছে দুই প্রজন্মের মধ্যে মানসিক স্তরের মরণপণ টানাটানি।

অংশুমালার লেখা কলামের নিয়মিত পাঠিকা সলমা। অংশুমালার সাহস ও উন্মুক্ত চিন্তাকে শ্রদ্ধা করে। আদর্শ নারী হিসেবে সে তাঁকে অ্যাডমায়ার করে। সে আশা করে তার ও পুষ্পার এই সম্পর্ককে অংশুমালা মেনে নেবে। কিন্তু অংশুমালা সে ভরসা দিতে পারেনি সলমাকে। সলমা তার বিবাহিত স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে পুষ্পার সাথে থাকতে চায়। তার স্বামীর আচরণের জন্য সে পুষ্পার কাছে বারবার ক্ষমা চেয়েছে এই সমস্ত বিষয়গুলোই সলমা ও পুষ্পার ভালোবাসাকে সাপোর্ট করে। বিসমকামী সম্পর্কের প্রেমে যেমন-মান-অভিমান ও বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় থাকে, সমকামের ক্ষেত্রেও লেখিকা দেখিয়েছেন এর কোনো ব্যতিক্রম থাকে না।

শেষে বহু-মানসিক টানাপোড়েনের বাঁক পেরিয়ে তবে অংশুমালা মুক্তভাবনার অধিকার দিতে পেরেছে পুষ্পাকে। অবশেষে অংশুমালা তার মনের ভাঙা বাড়িটার ভগ্নাবশেষের দিকে থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। সূর্য দেখা দেয় তার মনের কুটিরের নতুন গজানো বোধের সবুজ পাতাগুলোর পেছন থেকে। আকাশের গায়ে আবার রং ধরে অন্ধকারের পরে নতুন আলোর।

পুষ্পা ও সলমা পায় তাদের ভালোবাসার স্বীকৃতি। সেই ভালোবাসায় কাম থাক বা না-থাক, প্রেম যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ আর নেই অংশু বা সঞ্জয় কারোরই।

এইভাবে লেখিকা দুটি উপন্যাস 'বামবোধিনী' ও 'অভিজ্ঞান'-এর মধ্যে দিয়ে দুটি প্রজন্মকে এক মূল্যবোধের অভিজ্ঞানে উত্তীর্ণ করেছেন। যেখানে সংস্কার, সংস্কৃতি, দেশ-কাল, প্রজন্মের ব্যবধানকে তিনি ঘুচিয়ে দিতে সার্থক হয়েছেন। এখানে প্রজন্মের সাথে প্রজন্মের, ব্যক্তির সাথে প্রতিষ্ঠানের, শুভবুদ্ধির সাথে আবেগের, হৃদয়ের সাথে মেধার আবার কখনও তারুণ্যের সাথে মধ্যবয়েসের এবং সত্তার সাথে সত্তার

মতান্তরকে পেরিয়ে নতুন করে নিজেকে চিনে নিচ্ছে অংশুমালা, সঞ্জয়, মালিনী, পুষ্পা, সৌম্য, সলমা। শেষে সবাই এসে দাঁড়াচ্ছে, ওয়েন্ডির সাথে একই পঙ্‌ক্তিতে। 'বামাবোধিনী'-র সংশয় 'অভিজ্ঞান'-এ এসে নিঃসংশয় হতে পেরেছে দীর্ঘ এক দশকের পরে নতুন জীবনবোধ নিয়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই দুটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বিশাল এবং জটিল এক তত্ত্বকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। লিঙ্গপ্রেম ও সম্পর্কের বহুমাত্রিক বিন্যাস ও তার বহুমুখিতা কেন্দ্রিক নির্মাণ নিয়ে উপন্যাস দুটি বাংলা সাহিত্যে বিরল সংযোজন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

সমালোচনা : 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'

লেখক : জয় গোস্বামী

একটি বাংলা শারদপত্রে প্রথম প্রকাশিত 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল', জয় গোস্বামীর আদ্যন্ত কবিতায় লেখা একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। সম্পূর্ণ কাব্যভাষায় এবং ছন্দোবন্ধনে গঠিত এই উপন্যাসের অবয়ব। জীবনের গল্পকে কাব্যের ভাষা আর কাব্যের দেহ দিয়েছেন লেখক।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু একদিকে এক নারী যে নিজের মা ও ছোট বোনকে নিয়ে কাকার বাড়িতে নিরুপায় হয়ে আশ্রিতার জীবন অতিবাহিত করে এবং যথারীতি একদিন এক সম্পূর্ণ অচেনা পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে যন্ত্রণায় জীবন যাপন করে। ছোটবেলাকার এক বান্ধবী তাকে মানসিক বল জোগায় এবং যন্ত্রণাময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়।

অন্যদিকে এক বাউণ্ডুলে তরুণ কবি, তার অবিবাহিত দিদি ও পিসিমাকে নিয়ে যার সংসার। সে কবি হিসেবে সদ্য-পরিচিতি পাওয়ার সাথে সাথে প্রেম আসে তার জীবনে যার পরিণতি ছিল মর্মঘাতী। এইভাবে দুটো কাহিনীর বুনটে তৈরি কাব্য-উপন্যাস 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল।'

উক্ত উপন্যাসের যে অংশবিশেষ নিয়ে আমরা আলোচনা করব, তা হল 'তৃতীয় ভাগ' যেখানে কবির মনে প্রেমের সঞ্চার হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়কে আমরা এই অংশেই ধরতে পারব। এখানে আমরা সমগ্র উপন্যাসের আলোচনা না করে শুধু 'তৃতীয় ভাগের' নারী সমকামিতার অংশটুকুকে গুরুত্ব দিয়েছি বিষয়ের খাতিরে।

উক্ত উপন্যাসের কবি চরিত্রটি একটি বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, আত্মভোলা, সাদামাটা স্বভাবের। কবিতা লেখাই যার উদ্দেশ্য।

"সভা সমিতিতে না আর কখনও নয়
ভিড়ের ভেতর ভিড়ব না আমি আর

তা-তে যদি নাম না হয় তো না-ই হবে
প্রশংসা ভালো। টাকা-পয়সাও ভালো
কিন্তু অত যে অতিথি-অভ্যাগত
অত সভ্যের সামনে নিজের লেখা
পড়তে গেলেই মনে হয় কী রকম...
(যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল)

এমনই এক চরিত্রের কবি হঠাৎ একদিন দুই নারীর সংস্পর্শে আসে। মেয়ে দুটি কবির কবিতায় ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে কবির সাথে দেখা করতে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। কোলকাতাবাসী মেয়ে দুটির একজন 'নিশি' পত্রিকার সম্পাদিকা। যার সাথে কবি ডাকযোগে কবিতার লেনদেন করেন। অন্যজন এমএ-ছাত্রী—সম্পাদিকার বান্ধবী, কবির কাব্যের বিশেষ পাঠিকা।

কবি এই ছাত্রীর মুখে তার কবিতার প্রশংসায় ধসে যায় তার প্রেমে। তার কণ্ঠস্বরে কবির চৌষট্টিকলা যেন একলাফে জেগে ওঠে। কবি নিজের কথায় তা স্বীকার করেছে মনে মনে। জীবনে প্রথম নারীসঙ্গ পায় কবি, মনে মনে তার প্রেমে পড়ে আর ভিজতে শুরু করে প্রেমের বৃষ্টিতে। অন্যপক্ষ কী চায় কীভাবে মফস্বলের সাদাসিদে কবি-চরিত্র তার আঁচও পায় না। সেভাবে কবিতা থেকে নিজেকে আলাদা করে ভাবতে পারেনি। এই ভুলেরই মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই আজকের নারীর যে ছবি জয় গোস্বামী এঁকেছেন, সে নারী মনে যা ভাবে কাজেও তার প্রকল্প একই। তারা সংস্কারমুক্ত হয়ে পরিস্থিতির সাথে হাতে-হাত মিলিয়ে নিতে পেরেছে। সেখানে পুরুষ কবি তার মনের গতিকে মেপে নিতে অক্ষম। 'এ দুটি দারুণ মেয়ে। ছাদ থেকে ফেললে ড্রপ খাবে।' পাঠিকার ও সম্পাদিকার আহ্বানে কবি তাদের ঘরোয়া আসরে যায়, ডাকযোগে পাঠায় কবিতা লিখে। কবিতা পেয়ে পাঠিকা পাগল। তাকে নিয়ে কেউ কবিতা লিখেছে, তা-ও কি না তার প্রিয় কবি। আরো আরো কবিতার-কবিকে ভালো লাগে পাঠিকার। কবিও;

'ঘাবড়ে, সামলে, হেসে, জল খেয়ে তোতলা
লে-লেখায় কিছু ম-মনে করোনি তো?
পাঠিকা বলেছে, আমি কি যোগ্য এর?
চরিত্র বলে, আমিই যোগ্য নই...'
(যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল)

পড়ছিল যখন বৃষ্টি এমন ভিজছিল তারা দুজনে, হঠাৎই হল বজ্রপাত কাটল কবির ঘোর। কারণ অন্যপক্ষ এখানে খুব ভালো করে চেনে নিজের প্রকৃতিকে। তার কাছে এটা খুব স্বাভাবিক একটা ছন্দ কিন্তু কবির ঘটল ছন্দপতন। সে চেনেনি অন্য পক্ষের প্রকৃতির স্বরূপ। বৃষ্টি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল মোহনার দিকে।

"হঠাৎ যখন ঘুম আসে আসে
কী যেন আওয়াজে তন্দ্রাটা ভেঙে যায়
.....
যা ঘটছে সেটা বলা বেশ মুশকিল
একটি চাদর দুটি মনুষ্যমূর্তি
জড়ায় পিণ্ড তালগোলাকার হয়ে
দেখে আসে ওরা দুইসখী জনাকে
জড়াজড়ি করে এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে।"

"কবি বলে ওঠে, 'মিথুন মেরেছি আমি।
আমি সে নিষাদ, যে মিথুন বধ করে।"

কবি বোঝে পাঠিকাকে নিয়ে তার মনের ভেতর যে মিথুনমূর্তি ছিল, সেদিন রাত্রের ঘটনায় সেটা ভেঙে চুরমার হওয়ায় সে দস্যু থেকে বাল্মীকি হয়ে গেছে।

সম্পাদিকা তাকে বোঝায় যে;
"কবিতা ছাড়া তো যোগ্যতা নেই কিছু
শুধু কবিতায় প্রেমিকা বাঁচানো যায়?
তোমার প্রেমিকা? তোমারই প্রেমিকা বলে
যাকে জানো তুমি, কতটুকু জানো তার।"

এখানে নারী তার চাওয়া-পাওয়ার জগতে আর সংস্কারবদ্ধ বস্তাপচা মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয় না। সেখানে খুব ভালো করে সে বোঝে কোথায় কীভাবে তাকে প্রাপ্য থেকে এতদিন বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। কীভাবে তাকে শত শতাব্দীর পাওনা আদায় করতে হবে। তার জন্য আজ সে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে জানে। লেখক এখানে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন নারীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে।

এ তো গেল কবির প্রেমিকা, যাকে কবি প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি কোনো কিছু দিয়েই চেনে না। এবার আসি সম্পাদিকার কথায়;

"আমি মেয়েদের, মেয়েদেরই ভালোবাসি
প্রেমিক-প্রেমিকা বা বোঝায় প্রেম বলতে
নারী পুরুষের দেহঘনিষ্ঠ প্রেম
আমার কাছে তা নারীর দিকেই যায়
পুরুষের কোনো ভূমিকা সেখানে নেই
শুধু দেহ নয়। .....
পুরুষরা নেই, পুরুষরা কেউ নয়।"

কিন্তু কবির মতো বালক, শিশুর ও অধিক যারা তাদের জন্য সম্পাদিকার কোল অপেক্ষা করে মাতৃস্নেহ নিয়ে। তাই কবিকে সে সন্তান বলেই ভাবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক এখানে লেসবিয়ান নারীর মনে পুরুষ-সংক্রান্ত মানসিক ভাবনার অনেক প্রকারভেদের মধ্যেও একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। তাছাড়া; 'আমি যা করেছি শুধু শরীরের ঝোঁকে' এখানে সম্পাদিকার এই উক্তির মধ্যে দিয়েও আমরা তার ও পাঠিকার একটি শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট ভাষায় পাই, যা কোনো লেসবিয়ান সম্পর্কের মধ্যে খুবই স্বাভাবিক। এখানে লেখক কোনো রাখঢাক ছাড়াই লেসবিয়ান নারীর যৌন দিকটাকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করেছেন। এবং সমর্থন করেছেন বলে এক প্রকার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠিকাকে, অর্থাৎ কবির প্রেমিকাকে 'বাইসেক্সুয়াল' জেনে যাওয়ার পর আর স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। সেখানে কবির পৌরুষে আঘাত লেগেছে। এ নারী নিজের যৌনতাকে শুধু যথেচ্ছ ভোগই করে না, তাকে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যও ব্যবহার করে। অধ্যাপকের সাথে সম্পর্কের মধ্যে আমরা সেই কারণই দেখতে পাই। এ নারীর কাছে প্রেম ভালোবাসা একটা গোলামি সফ্‌ট পাঞ্জাবি। যেটা সে শরীরের সুখবোধে কখনও প্রফেসরকে পরিয়েছে, কখনও সম্পাদিকাকে পরিয়েছে, কখনও কবিকে পাঠিয়েছে। কিন্তু কবি :

"সে তো বোকা, সে তো ভাবেনি তোমাকে ছাড়া
তোমাকেই মনে জ্বালে সে দমন করে
.....
কে অবদমিত পালিয়ে বাঁচতে পারে?"

শেষ কথাটাই হল গুরুত্বপূর্ণ। এই কামনাকে দমন করে কে বাঁচতে পেরেছে, তাই কবিকে আবার যেতে হয়েছে পুরনো মেয়ের কাছে, যাকে সে দেখত আরো বহুদিন আগে। এই উপন্যাস আমাদের এমন দুটি নারীচরিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যারা আর তাদের যৌনপ্রকৃতি সম্পর্কে অজানা নয়। তারা তাদের সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সকে খুব ভালো করে জানে এবং গুরুত্ব দিয়েছে, সেখানে কোনো সংস্কারকে তারা এর বিপক্ষে দ্বন্দ্বের অবকাশ দেয়নি।

সবার এ বিষয়ে নিজস্ব মতামত থাকতেই পারে। কিন্তু বড় কথা হল, সাহিত্যের দরবারে সরাসরি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার দায়িত্ব লেখক নিতে অগ্রসর হয়েছেন। এভাবেই মানুষের প্রচেষ্টায় একদিন সমকামীদের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে মেনে নিয়ে সমাজ তাদের মুখোশ ছাড়া সুস্থ জীবনযাপনের অধিকার দেবে বলে আশা রাখি। লেখকের কাছে নারীদের এই স্পর্শকাতর ক্ষেত্রটা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, নারীদের কাছে এটাই একটা বড় পাওনা। সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দিকগুলোকে সাহিত্যে এড়িয়ে চলা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সমালোচনা : 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' লেখিকা : তিলোত্তমা মজুমদার : নারী সমকামিতার প্রেক্ষিতে; 'চাঁদের গায়ে চাঁদ'

যে সমস্ত মহিলা কথাসাহিত্যিকরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের সীমিত অভিজ্ঞতার জগতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেই তাঁদের চারপাশের জীবন, বদলে যাওয়া মানুষ এবং ততোধিক বদলে যাওয়া মেয়েদের ছবি এঁকে চলেছেন, তিলোত্তমা মজুমদার তাঁদের মধ্যে একজন। ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে আজন্মকাল মেয়েদের গণ্ডিবদ্ধ জীবনের মধ্যে থেকেও সমস্ত বিষয় অনুপুঙ্খ লক্ষ করার যে ক্ষমতা সহজাত, তারই জোরে লেখিকা বর্তমান সময়ের এক জটিল ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন এই 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে, যা বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী বাঙালি সমাজবিবর্তনের প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশেই বাঙালি পাঠককে চমকে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঋ' (১৯৯৬) এই উপন্যাসের অভিনবত্ব ও শৈলীগত নিরীক্ষা তাঁকে ব্যতিক্রমী লেখিকা হিসেবে চিহ্নিত করে। তিনি কলম ধরেছেন সমস্ত বাঁধাছকের বিপরীতে। বৈষম্য, বৈচিত্র্য, দার্শনিক গভীরতা—তার সাথে রচনাশৈলীর অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি যৌনতা-বিষয়ে সংকোচহীন সত্যভাষণ তিলোত্তমাকে তাঁর সমসময়ের অন্যান্য লেখিকাদের থেকে আলাদা করেছে।

'চাঁদের গায়ে চাঁদ' প্রথম প্রকাশ 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় (১৪০৯)। উপন্যাসে যৌনভাবনাকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এক দার্শনিক মাত্রা দেওয়া হয়েছে। মান্যতা পেয়েছে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ তথা যৌনস্পৃহার জগৎ, যা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পাঠককে এক নতুন দিগন্তের দর্শন লাভ করায়। অবশ্যই উপন্যাসে তিনি যে যৌনতা দেখিয়েছেন, তার অভিজ্ঞান রমণ-সর্বস্বতা নয়। নিবিড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা কিংবা বলা যায় তার চেয়েও বেশি কিছু এক গভীর মনন-তন্ময়তা।

লেখিকা এক কথকের আশ্রয় করে মাঝে মাঝে ঘটনাস্রোত থেকে সরে এসে বিবেকের ভূমিকা পালন করেন ও ঘটনার বিশ্লেষণ করেন। উপন্যাসের ঘটনা বয়ে চলে

নারী সমকামিতাকে কেন্দ্র করে, এবং যার পরিণামস্বরূপ যৌনতা এক অন্য মাত্রা পায়। যেখানে যৌনতার সঙ্গে মানবজীবন ও কর্মের সাথে মানবধর্মের যোগসূত্র নির্ধারণের প্রয়াস চলে অনবরত। গোটা উপন্যাসে লেখিকা খুঁজছেন এমন এক চালিকাশক্তিকে, যা মানুষের যৌনতাকে চালনা করে এবং মানবজীবনে তার প্রাধান্যের স্বরূপকে। এই বোধ তাঁকে সমগ্র উপন্যাসে ধাবিত করেছে। কামের পদশ্চারণ করে ক্রোধ, মমতা, প্রেম, প্রয়াস, অসফলতা বিবিধ আবেগকে তিনি দার্শনিক কাঠামোয় ধরার আকুল প্রচেষ্টা করেছেন।

লেখিকা উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঠককে খুব আন্তরিকভাবে নতুন কিছু দেখাবার, নতুন তত্ত্ব বোঝাবার জন্য যে-এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তার চর্চা করতে বলছেন। "তাহলে, তাহলে, এসো, এসো, আমরা অবলোকন করি, পর্যবেক্ষণ করি, প্রবেশ করি কোনও গভীর তত্ত্বে এবং কোনও তত্ত্বকে প্রকাশ করি।" কারণ আমাদের সংস্কার আমাদের দৃষ্টিকে গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখেছে। একমাত্র চর্চার মাধ্যমেই কোনো নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব। সাথে তিনি এ কথাও বলেছেন যে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই সামান্য থেকে অসামান্য স্তরে উত্তীর্ণ হয় শুধুই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। এর মধ্যে আরও একটা বিষয়ে লেখিকার মুন্সিয়ানা লক্ষ করার মতো, তিনি শুধু দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলেননি, তার সাথে নিরপেক্ষতার চর্চার বিষয়কে জুড়ে পাঠককে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে তুমি যা দেখবে তা তুমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করো। কারণ পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা এখানে খুব বেশি।

উপন্যাসে লেখিকা এক তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং বারবার কথকের ভঙ্গিতে ঘটনার প্রবাহের মাঝে মাঝে সরে এসে মনে করিয়েছেন যে সময় ও কালের প্রবহমানতায় সমস্ত তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল এবং সময় সাপেক্ষে মূল্যবোধ, মানবিক সম্পর্ক, মানুষের ভবিষ্যৎ—সবই বদলে যায়। বর্তমানের শত পরীক্ষিত সিদ্ধান্তও ভবিষ্যতে সংশয়ের থেকে মানুষ বা প্রকৃতি কাউকেই সংশয়াতীত করতে পারে না। যেমন পারেনি দেবরূপা, শ্রেয়া ও শ্রুতিকে। তাদের পরিকল্পিত নির্ধারিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থেকে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় দর্শন পড়তে আসা অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে শ্রুতি আত্মবিস্মৃতির বিপন্নতা থেকে নিজেকে উদ্ধার করে বহু দর্শনের পর নিজের অন্তরের আত্মার প্রকৃতির স্বরূপকে বুঝতে পেরেছিল। ইতিহাসই একমাত্র বলতে পারে কী ছিল, কী আছে।

উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয় উত্তর-কলকাতার এক ছাত্রী আবাসের ছাত্রীদের আবাসিক দিনচর্যাকে কেন্দ্র করে। কথক গল্প বলেন তিনটি মেয়ের, যাদের নাম শ্রেয়সী, দেবরূপা ও শ্রুতি। সাথে সাথে এ কথা বলেন, 'এই তিনজন এদের নাম হতে পারে মোক্ষদা, ক্ষণপ্রভা, মাধুরীলতা। কালসাপেক্ষে নামগুলো বদলে যায়, যেমন বদলায়

মানুষের ভাবনা, হৃদয়, গৃহস্থী।' কথক্ এখানে এক আবহমানের কথকতায় আগ্রহী, কাল তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজন এবং বর্তমান নিছক এক সময়ের মাত্রা যা, প্রয়োজন অনুসারেই ব্যবহার্য।

উপন্যাসের কাহিনী দুটো পর্বে বিভাজিত। এ বিষয়টা নারীকেন্দ্রিক, কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রুতি বসু। প্রথম পর্বের ছাত্রী শ্রুতি বসু জীবনের নানান মধ্যবিত্ত সমস্যাগুলোর সাথে সংগ্রাম করতে করতে জীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের অভিজ্ঞ তাত্ত্বিক 'দৃষ্টিসম্পন্ন' শ্রুতি বসু হয়ে ওঠে।

ছাত্রী আবাসের সমকামিতার বিষয়ে নতুন জ্ঞান তার হয়। এবং পরবর্তীকালে একটা সমাজকল্যাণ সংস্থায় কাজ পায় এবং সেখানেও সে তার ছাত্রী আবাসের সমকামী বান্ধবী দেবরূপাকে সহকর্মী হিসেবে পায়। এবং এই দেবরূপার মধ্যে পূর্বে দেখা দেবরূপার সমন্বয় করে এক নতুন দেবরূপাকে সে চিনে ওঠে। যে দেবরূপা নারীর শরীরে পুরুষপ্রকৃতি বহন করছে। নারী সমকামীদের যুগলে যাদের (বুচ) পুরুষালি গঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা এ ধরনের নারীদের কথা উল্লেখ করেছি, যারা এক রকম ভ্রান্ত উদ্ভাসের মধ্যে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই শল্যচিকিৎসার দ্বারা এই সমস্যা মেয়েটিকে পুরুষলিঙ্গে পরিবর্তন করতে পারে এবং সন্তান হওয়াও সম্ভব। যে কারণে ললিতা যে মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ তার সাথেও দেবরূপার যৌনকর্মে কোনো আপত্তি ছিল না অথচ সে কোনো প্রকৃত পুরুষকে সহ্য করতে পারত না। এরই মাঝে মাঝে কাহিনীতে ঢুকে আছে সমাজের নানান অসংলগ্ন নিচুশ্রেণীর মানুষের দুঃখ-দৈন্য, অসহায়তা, যৌনতার করুণ ও ভয়াবহ কাহিনী। যেমন ভলুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ও শ্রুতির অভিজ্ঞতা দিয়ে পাঠককে দেখানো হয়েছে এক মর্মান্তিক যৌনজীবন। যার বস্তুগত তথ্য শ্রুতিকে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আরেকটা উদাহরণ এখানে দেওয়া হল এই প্রসঙ্গে যেমন : "পথের শিশুদের কেসহিস্ট্রি লেখার যে ছাপানো ও পয়েন্টসমৃদ্ধ ফর্ম আছে, তাতে অনেকগুলো পয়েন্টের মধ্যে একটা হল; সেন্টারে আসার আগে সে কোথায় বাস করত। সেখানে শৌচাগারের সুযোগ-সুবিধা কী ছিল। এই পয়েন্টের নিচেই আরেকটি অসামান্য পয়েন্ট। পথবাসী শিশুটি কতদিন ধরে পথে বাস করছে। পথে বাস করার কারণ, পথে বাস করার সুবিধা ও অসুবিধা।"

(চাঁদের গায়ে চাঁদ)

শ্রুতির মুখে তখন আমরা শুনতে পাই,—'জোক অব দ্য সেঞ্চুরি! কথাটা পথে বাস করার মতো সুবিধাও এই শতাব্দীতে আছে, একথা ভেবে সে হাসে এবং বাস্তবের কুহকতাকে বুঝতে পারে। এভাবেই নানা সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখে শ্রুতি হয়ে ওঠে এক দার্শনিক শ্রুতি বসু। এই জন্যই হয়তো লেখিকা বিজ্ঞানের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল

ভবিষ্যতের ছাত্রী শ্রুতি বসুর ভবিষ্যৎকে নিজের হাতে নষ্ট করে তাকে দর্শনের ছাত্রী করে সম্পূর্ণ করালেন তার জীবনদর্শনকে, যা আসলে তিনি শ্রুতির মধ্যে দিয়ে করাতে চেয়েছেন তাঁর পাঠককে।

পর্বের পরের শ্রুতির অংশটা পরিণত দার্শনিক শ্রুতির ডায়েরির ধরনে লেখা। ছাত্রী আবাসের দেবরূপাকে সমকামী জেনে একদিন শ্রুতির মনে যে ভয় ও ঘৃণা দুই-ই হয়েছিল আবার জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে এতটাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল যে উপন্যাসের শেষে সমকামী দেবরূপাকে নারী স্বভাবোচিত ললিতার (পুরুষ) সাথে কামোত্তেজিত অবস্থায় দেখে তার রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন তাত্ত্বিক প্রেমের কথা মনে হওয়ায় সেই দৃশ্যকে অসাধারণ দৃশ্য বলে মনে হয়। সে অনুভব করেছে এটাই সেই যৌন অনুভূতি, যা সে নিজে পারে না, দেবরূপা যা পারে, তা প্রত্যক্ষ করে তার সুখানুভূতি হয়। শ্রুতি বুঝেছিল যে একদিন আবাসিকের মেয়েরা তার প্রতি সমবেত প্রতিবাদ ও বিধান দিয়েছিল সে 'ভয়ার' (voyeur)। সেদিন এ কথার মানে শ্রুতিকে অভিধান খুলে বুঝতে হয়েছিল। শ্রুতি সেদিন নিজেকে এই শব্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের শেষে শ্রুতি বুঝেছিল সত্যিই সে যা পারে না, তা প্রত্যক্ষ করে সে সুখানুভব করে।

'a sexual Pervert who drives gratification from surreptitiously watching sexual act or objects: a Peeping tom: one who takes a morbid interest in sordid sights.'

(চাঁদের গায়ে চাঁদ)

সে অনুভব করেছিল দেবরূপার শরীর প্রকৃতি ছাপিয়ে গেছে। মন প্রকৃতিতে মিলেছে। যেমন বৈষ্ণবধর্মে বলা হয় বিবর্ত বিলাসের রতি-আতুরা রাধা নারীর সক্রিয়তার প্রতীক। লেখিকা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যৌনতা ও সৃষ্টিরহস্য পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কিত হলেও মানবজীবনে যৌনতা শুধু প্রজনকেন্দ্রিক নয়।

এ কথা লেখিকা আরো একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন শ্রুতির জড়বুদ্ধি ভাই ওলুর মধ্যে দিয়ে। যার মানসিক বোধের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে বয়সোচিত যথাসময়ে যৌনতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যা দেখে শ্রুতি মনে মনে ভাই ওলুর কামোত্তেজক অবস্থাকে দেখে কষ্ট পেয়েছে। বুঝেছে যৌনতা মানুষের প্রকৃতির সাথে, তার প্রবৃত্তিতে মিশে আছে রক্তমাংসের মতো। তাতে কোনো পাপ-পুণ্য নেই —যা শরীরের খিদে-তেষ্টার মতোই একটা স্বাভাবিক বোধ, যার হাত থেকে জড়বুদ্ধি ওলুরও নিষ্কৃতি নেই। শ্রুতি অনুভব করেছে মানুষের পাপবোধ যত স্পষ্ট—পাপের অস্তিত্ব তত স্পষ্ট নয়। পৃথিবীতে এই একটি কর্ম যা স্পষ্ট নয় কিন্তু ফলাফল স্পষ্ট।

লেখিকা উক্ত উপন্যাসে, মানুষের যে বয়স থেকে শরীর-সম্বন্ধীয় সচেতনতা শুরু হয়, সেখান থেকে শুরু করে সমস্ত দিকগুলোকে খুব সচেতনভাবে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখিয়েছেন। এই যাত্রাপথে বিশেষত মেয়েটিকে সমাজ কোন চোখে দেখে, সমাজের প্রতিক্রিয়ার দরুন মেয়েটির সমাজের প্রতি ও জীবনের প্রতি কী মূল্যবোধ তৈরি হয়। এই সমগ্র বিষয়কে তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন নৈপুণ্যের সাথে। বিজ্ঞান, ধর্ম সমস্ত কিছুর গভীরে পাঠকচিত্তকে অবগাহন করার আকুল চেষ্টায় ত্রুটি রাখেননি। উপন্যাসে যৌনতার নানান বাঁককে দেখানো হয়েছে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে। কীভাবে একটি ছেলে বা মেয়ে বয়ঃসন্ধিক্ষণে বুঝতে পারে তার প্রকৃত যৌনপ্রকৃতি কী। যেমন করে বুঝেছিল একদিন দেবরূপার ভাই অথবা ললিতা যে বোঝা বা না-বোঝার বাইরে এক অসহায় দুর্ভাগ্যের বাহক। অন্যদিকে শৈশব থেকেই কীভাবে একটু একটু করে বিকাশ ঘটেছিল দেবরূপার চরিত্রের মধ্যে সমকামিতার উপাদানগুলোর। মেয়েদের প্রতি বা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ছিল দেবরূপার প্রকৃতিগত, যা তার শৈশবকাল থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল ভাই দেবাংশুকে মেয়ে সাজিয়ে রাখার মধ্যে দিয়ে।

এভাবে একজন মানুষ এক-একটি পৃথিবী তৈরি করে। সেই 'পৃথিবীতে কত তত্ত্ব– কতরকম ভুখ আর কতরকম খিদা। ... আর সব খিদের কত তত্ত্ব। আর মানুষের তত্ত্বে তত্ত্ব বসায় আপন অসম্পূর্ণ চিন্তার অচিন্ত প্রয়াসে। ... আসল কথা মানুষের মধ্যে তত্ত্ব। মানুষের মধ্যে দর্শন। যা থেকে তাই থাকে। তাই তাকে করতে হয়। না করে সে কী করবে। যার মধ্যে যা আছে, তার প্রকাশ না করে উপায় নেই।'

(চাঁদের গায়ে চাঁদ)

লেখিকা হয়তো পাঠককে বলতে চেয়েছেন যে যা আছে এই প্রকৃতির অন্তর্গত এই ধরায় তাকে ধরো। আমরা এমন কিছু ধরায় দেখতে পাই না, যা প্রকৃতি বহির্ভূত। প্রত্যেক মানুষ এক-একটা পৃথিবী আর মানুষের সাথে মানুষের মিলন ও প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এক পৃথিবীর সাথে আর এক পৃথিবীর সমন্বয়। অর্থাৎ কি না গভীর তত্ত্বের ও তথ্যের খনি দুই মানুষের সম্পর্ক, যাকে আমরা শুধু বাহ্যিক সংস্কারাচ্ছন্ন চোখে ও মনে বিচার করার ক্ষমতা রাখি না। তা কোনো নির্দিষ্ট নীতিতে নিবদ্ধ হতে পারে না। তাকে জানার-বোঝার জন্য স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও সহনশীল মননের প্রয়োজন। মানুষ প্রকৃতিকে না বুঝেই করতলগত করতে চায়। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝতে শেখে বহু অধ্যায় পার করে। ততদিন পর্যন্ত সে তৈরি করে প্রকৃতির বিরুদ্ধগামী আইন। আর বেশির ভাগ সময়েই মানুষের তৈরি আইন, কানুন, নৈতিক বিধিবদ্ধতা মানুষকে যথাযোগ্য মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয় না।

কে কখন কার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করল, তা তার প্রকৃতি-নির্ভর। এখানে

মানুষ পুরুষ-পুরুষকে কামনা করল বা নারী-নারীকে, সবটাই তার প্রকৃতিজাত। সেখানে বড় কথা দুটি প্রেমিক-আত্মা তৃপ্তি পেল। প্রকৃতির বিরোধী নয় কিছুই। তবে যদি শিক্ষিত মানুষ পরিবেশ-দূষণের দাবি তোলে তাকে অনায়াসেই বলা যেতে পারে তুমি যে দাবি তুললে তা তোমারই প্রকৃতি-নির্ধারিত এবং প্রকৃতি তোমাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ তোমার মধ্যের দুটি সত্তাই প্রকৃতির অংশ, যা তোমার জিনবাহিত তার প্রকাশেও সহায়তা করে পরিবেশ। তাহলে এ-কথা স্পষ্ট যে সমকাম প্রবৃত্তিও অধিকতর প্রকাশিত হয়, যদি সেই মানবসন্তানের পূর্বমানব কোনও সময়ে এই প্রবৃত্তির ধারক হয়। আসলে আমাদের মধ্যে যে যৌন প্রবৃত্তি ও প্রবণতা, যা জিনবাহিত তা আমাদের মনের অন্ধকারে থাকে। কিন্তু তার যে সামাজিক প্রকাশ তা আমাদের মস্তিষ্কের রসায়নশালায় জারিত হয়ে নিয়ত আমাদের সক্রিয়তার দিকে চালনা করে। অতএব, সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্রই হল মস্তিষ্ক।

কামবোধকে কুসংস্কার ও অনন্ত পাপবোধের সাথে মিশিয়ে এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য আত্মসংযমের নির্দেশ দেওয়া হয় ধর্মে। ধর্মের নির্দেশ—সংযম দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করে কামকে বশ করো। সংযম বলতে শৈশব থেকে যৌনসংযম বোঝানো হয়। নিবৃত্তি বলতে যৌননিবৃত্তি বোঝানো হয়। এই বোঝানো হল আসলে অপূর্ণ বোঝা।

এই সংযম কিন্তু পশু-প্রবৃত্তিতে বর্তমান নেই। আছে শুধু মানব-বৃত্তিতে। মানুষের বুদ্ধি আছে, অতএব মানুষের চেতনা বিকৃত হতে পারে। পশুর বুদ্ধি স্থিরবুদ্ধি, সেখানে চেতনা বিকৃত হবার সম্ভাবনা নেই। তাই পশুচেতনায় যা কিছু সবই স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। অতএব সেখানে স্বাভাবিক ধর্মই আমরা দেখি। হরিণ, শূকর, বানর, হাঁস ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরে টানে ও সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়। মানুষ প্রকৃতিকে না-বুঝেই অনেক কিছু হস্তগত করতে চায়, যার ফলে অনেক বিষয়ই মানুষকে চরম মূল্য দিয়ে শোধ করতে হয়। বা এতাবৎ কাল করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক গ্লোবাল-ওয়ার্মিং এ রকমই একটা মানব-প্রতিস্পর্ধার পরিণতি।

এ বিষয়ে সামাজিক দূষণের দোষারোপও মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি পূর্বনির্ধারিত ধারণাজনিত উদ্ভূত ভাবনা, যা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয় বা যুক্তিগ্রাহ্যও নয় বলেই ধরা যেতে পারে। সমকামী সম্পর্কের মানুষের যৌনতা বা কামক্রিয়া কখনোই প্রজননভিত্তিক না কিন্তু বিসমকামী মানুষের যৌনতাও সর্বদা সৃষ্টির জন্য হয় না। ফলে এই ধারণার কোনো সারবত্তা নেই যে, প্রজনন নেই তাই সমকামিতা স্বাভাবিক সম্পর্ক নয়। যদি আমরা স্বাভাবিক সম্পর্কে এই সমস্যাকে মেনে নিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর সাহায্য নিয়ে উপায় পেতে সক্ষম হই বা নিয়তিকে মেনে নিয়ে চলি তবে সমকামীদের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? আবার এ কথাও বলা যায় যে বিসমকামী

মানুষের অনেক সময় বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ থাকে। তেমনি সব মানুষের মধ্যেই সমকামিতার জিন বা প্রবণতা থাকে না, এ কথাও সত্য। যেমন পশুপাখির ক্ষেত্রেও তা বিশেষ কিছুতেই লক্ষিত। অতএব অহেতুক এই কারণগুলোকে সমকামিতার বিপক্ষে উপস্থিত করাকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করা একপ্রকার প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

অতএব এখানে লেখিকা বলেছেন, হে পাঠকগণ চোখ আড়াল কোরো না। এই দুনিয়ার সবই যে নয়নাভিরাম হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু দৃষ্টিকটু, শ্রুতিকটু বহুকিছু থেকেই আমরা জীবনকে চিনে নেবার উপকরণ পেতে পারি। "তাহলে চলো। আমরা অজ্ঞতা মোচন করি। সংস্কার উড়িয়ে আলো আনি... বুকে টেনে নিই পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে। নারী-পুরুষ বিভেদ না করে বুকে ধরি এসো। নাই-বা রইল কামবোধ উদ্দীপনা, প্রেম তো রইল। রইলই-বা কামবোধ উদ্দীপনা, প্রেমও রইল। আসলে মানুষে মানুষে প্রেম, নারীতে নারীতে হোক, পুরুষে পুরুষে হোক, নারীতে পুরুষে হোক।"

শেষে এ কথা বলাই বাহুল্য যে লেখিকার যৌনতা সম্পর্কে এই দার্শনিক ব্যাখ্যা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পেরেছে।

যেখানে চিরসত্যের সাক্ষী সূর্যের দিকে তাকিয়ে আরও এক সত্যকে দর্শনের মাধ্যমে উপলব্ধি করিয়েছেন পাঠককে।

"চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করব কি..."

'উপসংহার
"মেয়েরা তো মেয়েদের মতো কথা বলবেই।
বাসনে লেগে থাকা ছাই ও সাবান
নতুন কোন অভিজ্ঞান এনে দেবে কি না
ওরাই শুধু জানে?"
— চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

যেমন করে জেনেছিল 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসের লেখিকা অংশুমালা কালের প্রবাহে কখনও নিজের ভেতরের দ্বন্দ্ব কখনও বাইরের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। চিরন্তন সংস্কারের ভিত্তিমূলে আলোড়নে ভেঙে যাওয়া পুরনো বাড়িটার ধ্বংসের পরে নতুন পৃথিবীর নতুন আলোয় ধীরে ধীরে পুরনো পৃথিবী ও তার ইতিহাস অন্য রকম মনে হতে থাকে। অংশুমালা যেন নিজের কাছেই প্রশ্ন করে, পুষ্পাকে সে নতুন করে চিনতে।

'ও মেয়ে চিনবে না তুমি,
ও এখন ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়;
প্রভুর না, পিতার না,
ও মেয়ে কারোর আজ নয়!'
— কৃষ্ণা বসু

'প্রভু সাজার ইচ্ছে হলে
প্রেমিক তুমি নও
ভালোবাসবো আদর দেবো
বন্ধু যদি হও।'
— মল্লিকা সেনগুপ্ত

এই মেয়েদের আছে প্রত্যয় ও সম্ভাবনা। আজকের নারী এই ভাবেই নিজের মতো করে যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান খুঁজে নেয়। যেমন করে নিজেকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিগত সেক্সুয়েল প্রেফারেন্সকে আমল দিয়ে সঠিক দিশায় পথ চলেছিল; দেবরূপা, পুষ্পা, সম্পাদিকা ও এম.এ. ছাত্রীটি। তারা হা-হুতাশ করে ভেঙে পড়ে ভাগ্যের দোহাই দেয়নি। অথবা নিয়তি বলে অকেজো সংস্কারকে মেনে নেয়নি। তারা বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাধান খুঁজে এগিয়ে গেছে। কিন্তু বহুযুগ নারী এ সাহস পায়নি, যেমন পায়নি এক দশক আগের বামাবোধিনীর অংশুমালা। তাকেও বহু মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এই সংস্কারের দড়ি কাটতে হয়েছে। পুষ্পার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা বারবার পেছনে টেনেছে। যদিও সে ছিল সমাজসংস্কারক লেখিকা তথাপি নিজের ভাবনাকে নিজের ক্ষেত্রে কার্যকরী করতে তাকে বহুবার মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে দেখেছি আমরা।

"আমার নিখিল তবু আমার তেমন করে নয়,
ওপরে দুহাত মুক্ত ভেতরে দুহাতে বদ্ধ ভয়।'
—গীতা চট্টোপাধ্যায়

নারীর জীবনে এই ভয়ের অনেক কারণ আছে। সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সবকিছুই এক পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন। আর যার প্রতিনিধিত্ব করে প্রত্যক্ষভাবে তার পিতা-ভ্রাতা নামক পুরুষটি বহু দিনের অভিজ্ঞতায় আজ তারা বুঝতে পারছে যে তাদের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস দুই-ই পুরুষের থেকে পৃথক। আজকের নারী নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে শুরু করেছে সমকাল ও অতীতকে। যদিও তার গতি এখনও মন্থর। ফলে সনাতন মূল্যবোধগুলো ভেঙে যাচ্ছে। ইতিহাসের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। মিথ্যের বিনির্মাণ হচ্ছে। সত্যের রূপান্তর ঘটছে। জন্ম হচ্ছে নতুন-নতুন সত্যের। অবশ্যই বিরোধ-বাধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। আর এই নতুন সত্যের প্রেক্ষাপটে জন্ম হচ্ছে এক নতুন বিশ্বের। সে বিশ্বে নারীও ইতিহাসের স্রষ্টা। সমকালের রচয়িতা। যেমন করে তিলোত্তমা মজুমদার বা নবনীতা দেবসেন তাঁদের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলোকে উপন্যাস

রচনায় নতুন মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা সাহিত্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবু এক জায়গায় গোরাকে বলেছেন যে 'বিরোধ ও বাধা ছাড়া সত্যের পরীক্ষা হতেই পারে না।' সত্যের পরীক্ষা কোনো প্রাচীন কালে একদল মনীষীর কাছে একবার হয় গিয়ে চিরকালের মতো চুকেবুকে যায় তা নয়, প্রত্যেক কালের লোকের কাছেই বাধার ভিতর দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নতুন করে আবিষ্কৃত হতে হবে।

নারীকে লিঙ্গবৈষম্যে হীনতর প্রতিপন্ন করার এই ঘৃণ্য চক্রান্ত কেন? বঞ্চনার মূল উৎস নিহিত রয়েছে অর্থনীতিতে। সমাজ নির্মিত লিঙ্গভেদ প্রকৃতপক্ষে একটা ক্ষমতার নির্মাণ। এ বিষয়ে নারীর সম্মতি বা অসম্মতি কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দেয়নি পুরুষতন্ত্র। বোভোয়ার তাঁর 'Second Sex' গ্রন্থে বলেছেন; জৈবিক পরিচয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গৃহীত হওয়া আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে নারী নির্মিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান। আজন্ম বৈষম্যের শিকার হতে-হতে নারীর মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক হীনমন্যতা ও এক রকম সতর্কতা। যা তাকে শরীর ও মনে সর্বদা পীড়িত করে। এর থেকেও অঙ্কুরিত হয় সমকামিতার প্রবণতা ও লক্ষণগুলো। তাদের হাঁটা-চলা, শোয়া-বসা, এমনকি যৌন বিষয়টিও নির্ধারিত করে দেয় পুরুষতন্ত্র সমাজব্যবস্থা। ফলে একটি মেয়ে অনেক ক্ষেত্রে এই অন্য একটি মেয়ের কাছেই খুঁজে পায় তার সব রকম ভরসাস্থল। তা শরীর-সংক্রান্তই হোক বা মানসিক অবলম্বনই হোক। নারী সমকামিতার বিষয়গুলোও তাই খুবই জটিল। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে এর নির্ধারিত লক্ষণ বা কারণ বলে চিহ্নিত করা যায় না। দাম্পত্যজীবনে পত্নী পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে আত্মতার লৈঙ্গিক বিভাজন স্পষ্ট হয়ে যায়। নারী তাৎপর্যপূর্ণ 'অপর' ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয়। এ এমন এক অভিজ্ঞতার জগৎ, যার অন্তরের কথা বোঝা ও ব্যথার অনুভব কোনো নারীই একমাত্র করতে পারে। যেমন করে 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে শ্রুতি উপলব্ধি করেছিল বহু নিদর্শনের পর দেবরূপার যন্ত্রণাকে। পুষ্পা বুঝতে পেরেছিল সলমার জীবনে পুষ্পা কতটা গুরুত্ব রাখে। কী আছে এই অভিজ্ঞতার জগতে যদি আমরা প্রশ্ন করি নারীকে—শুনতে পাব বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসা শত শতাব্দীর নারীদের থেকে শুরু করে আজকের নারীর কাছেও—তার একই উত্তর; নারীত্বের অনুভব, বন্ধন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা... পুরুষের ভালোবাসার প্রতি তীব্র আর্তি; মাতৃত্বের অনুভব, শেষে নিঃসঙ্গতা ও একঘেয়েমি।

"ভালোবাসার পালায়
মুখ্য ভূমিকায় রেখেছ নিজেকে
পার্শ্বচরিত্রে আমি
এ এক চিরন্তন খেলা—"

—চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

এই চিরন্তন খেলাকে অস্বীকার করেছিলেন বৈষ্ণবধর্মের পূজিতা চরিত্র, যাকে হিন্দুশাস্ত্র 'কলঙ্কিনী রাধা' নামে অভিহিত করেছে; "বহুগামী সমস্ত পুরুষ কৃষ্ণকে তীব্র ভর্ৎসনায় ও সখীদের প্রতি সহমর্মিতায় এবং নারীকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চনা ও ধর্ম-সমাজনীতির নামে পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাধাকে বা তাঁর মতো নারীদের আবিষ্কার করা যায়। রাধার স্বামী বা সন্তান নেই। রাধা দেহকে সন্তানোৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে দেননি। নপুংসক স্বামীকে দেবতা রূপে স্বীকার করেননি। প্রেমের নামে ছলনাকে গ্রহণ করেননি। ঈশ্বর-কৃষ্ণের কঠোর সমালোচক ছিলেন রাধা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজবিধানকে ক্রমাগত অগ্রাহ্য করেছিলেন তিনি। পুরুষতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক এ নারীকে শাস্ত্রকারেরা খুব একটা মর্যাদা দেননি। রাধা-পূজার আদি-প্রবর্তক কৃষ্ণ ক্রমে গীতা-মহাভারত-ভাগবতের প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়ে নরনারায়ণ হয়ে ওঠেন। আর রাধার নির্দেশে, পরিচালনায় ও মাধ্যমে কৃষ্ণের সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার তথ্য ক্রমে অন্তরালে চলে যায়। কৃষ্ণের জীবনে বহু নারীর একজনে পরিণত হয় রাধা। ভাগবত থেকে শাস্ত্রকারেরা তাঁর নাম মুছে দেয়। রাধার গুণাবলি হরণ করে কৃষ্ণে সেগুলো আরোপ করে, পুরুষতন্ত্র। 'মহামাতৃকা' রাধাকে পুরুষের অনুগত এক চরিত্রে পরিণত করেছে।"

— (শক্তিনাথ ঝা— অন্য এক রাধা)

"ভ্রষ্ট আমি করি নাকি শতাব্দীর শুদ্ধ অন্তঃপুর
হে কুমারী, তুমি জানো আমার আকাঙ্ক্ষা লোকাত্তর।"
—চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

এই লোকাত্তর আকাঙ্ক্ষার জন্যই নারীকে পোড়ায় তার যৌবন প্রেম একাকীর দুঃখে। তাই আজ শতাব্দীর পুরনো অন্তঃপুর ভ্রষ্ট করতেও নতুন প্রজন্মের নারীর কোনো আপত্তি বা পাপবোধ নেই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলার সেই স্বীকারোক্তি; 'দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইবে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ সবল হওয়া বড় কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।' (ঘরে বাইরে)

অতএব বলা যায়, জৈবিক পরিচয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গৃহীত আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নারী হয়ে গড়ে-ওঠার মধ্যে রয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অসঙ্গতি, অনেক সময় তারই প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় সমকামীর মতো মানবিক সম্পর্ক। যেখানে নারী নিজের মতো করে খুঁজে পায় তার নিজের শরীরকে মনের জগতে আর অনুভব করে তার নারীত্বকে। এভাবে তারা প্রচলিত সত্যের বিপরীতে সত্য নির্ণয় করে।

"জগৎ যারে ধর্ম বলে আমি বলি অধর্ম
জগৎ যারে সত্য বলে আমি বলি মিথ্যা,

জগৎ যারে পিতা বলে, আমি বলি মাতা।"
(অন্য এক রাধা)

যেদিন সমাজ থেকে পুরুষের তৈরি করা 'নারী'-র মেকি বিভাজন নিঃশেষ হবে ও সমাজের প্রত্যেকটি নারী নিজেকে জৈব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারবে, নিজেকে মুক্ত মানুষ বলে ভাবতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেদিন হয়তো আর 'সমকামকে' কোনো আলাদা শ্রেণীভুক্ত হতে হবে না। মানুষের সাথে মানুষের প্রেমই সফল ও সার্থক প্রেম তথা সার্থক কাম। সমলিঙ্গের কামনাই 'সমকাম'। যদি আরো পাঁচটা বিষয়ে যেমন প্রকারভেদ থাকে তাহলে কামনা, যৌনতা, প্রেমেই-বা কেন প্রকারভেদ থাকবে না। মানুষ মাত্রেই আমরা কত রকম প্রকারভেদ পাই। দেহগত, গুণগত, বুদ্ধিগত, জাতিগত, স্থানগত, দৈহিক গঠনগত। অতএব, অন্য সব বিষয়ে প্রকারভেদকে আমরা যদি মেনে নিতে পারি, শুধু যৌনতার ক্ষেত্রে ও প্রেমের ক্ষেত্রে কেন তাকে অস্বীকার করব।

আমাদের সংস্কৃতিতে 'যৌনতা'কে সবসময় 'অশ্লীলতা'র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা হয়, বিশেষত যদি তা নারীর যৌনতার ক্ষেত্রকে নির্দেশ করে। জীবজগতের জীব মাত্রেই যৌন এবং যৌনতাপ্রবণ। অথচ যে মুহূর্তে নারীর আচরণে বা আকাঙ্ক্ষাতে যৌনতার ন্যূনতম প্রকাশ ঘটে, তখনই তাকে অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

অতএব জীবমাত্রেই যৌন, সেখানে শুধু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে লিঙ্গ-বিভাজনে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। নারী তাই বঞ্চনার যন্ত্রণায় তার স্বাভাবিক প্রবণতাকে পূর্ণ করার প্রয়াসে অনেক ক্ষেত্রে বিকল্পরূপে সমকামিতাকে বেছে নেয়, যা বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

বর্তমান সমাজে যদি নারী-সমকামী বা পুরুষ-সমকামীদের আইনত স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকার দেওয়া হয়, যথাযথ সামাজিক মর্যাদা তারা পায়, তবে তারা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। এবং এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে যেমন প্রতিরোধ করা যায় কিছু অংশে, তেমনই এরা সুস্থ স্বাধীন মর্যাদায় সমাজে বাঁচবার অধিকার পেলে অনেকেই হয়তো সন্তান দত্তক নিতেও সাহস পাবে বা আগ্রহী হবে।

আশা করি, আগামী প্রজন্ম আরও উদার ও নিরপেক্ষ হবে। তার প্রমাণ সমাজের বহুক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে।

চলচ্চিত্রের জগতে আজ থেকে নয়, অনেক দিন থেকে এ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। 'ফায়ার' থেকে শুরু করে 'আরও একটি প্রেমের গল্প' তার দৃষ্টান্ত।

অতএব আশা করি, আগামী বিশ্ব সমকামী মানুষদেরও সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতোই বাঁচার অধিকার ও মর্যাদা দেবে।

তাই শুধু চলচ্চিত্রে নয়—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক সর্বোপরি সাহিত্যের বহুল চর্চায় সমকামিতার মতো একটি স্বাভাবিক ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকারের দাবি করা মানুষকে আর প্রান্তিক করে রাখবে না।

'গ্রন্থপঞ্জি'

Beginning theory An Introduction to literary and cultural theory Peter Barry.
উত্তরাধুনিক ও সমালোচনা তত্ত্ব : রাশিদ আসকারী।
গোরা ও বিনয় : তপোব্রত ঘোষ।
সিমন দ্য বোভোয়ার : স্ত্রীলিঙ্গ।
অন্য এক রাধা : শক্তিনাথ ঝা।
বাংলায় মেয়েদের ভাষা : শর্মিলা বসু দত্ত।
ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন : নারায়ণ সান্যাল।
পিতৃতন্ত্র কাকে বলে? কমলা ভাসীন।
চাঁদের গায়ে চাঁদ : তিলোত্তমা মজুমদার।
যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল : জয় গোস্বামী।
বামাবোধিনী : নবনীতা দেবসেন।
অভিজ্ঞান : নবনীতা দেবসেন।
অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া।
সাহিত্য ও মুক্তমনা ইয়াহু গ্রুপের জন্য লিখিত অনলাইন আর্টিকেল অর্নব দত্ত (তথ্য গৃহীত হয়েছে)।
ধ্রুপদ : (২০০৫) প্রসঙ্গ নারীবিশ্ব।
সম্পাদক : সুধীর চক্রবর্তী।

শঙ্করী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৭ সালে, শৈশব কেটেছে পিতা মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জামসেদপুরে। লেখাপড়া জামসেদপুরের 'সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল' ও 'জামসেদপুর ওমেন্স কলেজে'। পড়ালেখায় অদম্য উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক চাপে ছোট বয়সেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু নানান প্রতিকূলতার মধ্যেই শঙ্করী তার পড়ালেখা চালিয়ে যান। তখন শঙ্করী পুত্রসন্তানের জননী। এইভাবে

পারিবারিক ও নিত্য সংসারযুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েও অদম্য মনোবলকে সম্বল করে অর্থশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হন। তার দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের আগমনে আরও জড়িয়ে পড়েন সংসারে। তার ওপর প্রায় ১৭-১৮ বছর কেটেছে মধ্যপ্রদেশের এক কোলিয়ারি অঞ্চলে, সেখানে লেখাপড়া বা সাহিত্যচর্চার কোনো সুযোগই ছিল না সেই সময়। না ছিল কোনো পাঠাগার, না পাওয়া যেত কোনো পত্রপত্রিকা। সাংস্কৃতিক কোনো পরিবেশই ছিল না। কিন্তু শঙ্করীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাই যেই মুহূর্তে শঙ্করী তার স্বামীর বদলি সুযোগে দিল্লিতে এলেন সাথে দুই সন্তান আর মনে অদম্য উৎসাহ একটা কিছু করার। ছোট পুত্রকে কলেজে ভর্তি করতে গিয়ে নিজেও ভর্তি হলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা সাহিত্যে এমএ করলেন। এই এমএ পড়তে পড়তেই তার উৎসাহ এক বিতর্কিত বিষয়ে, যা নিয়ে এই বই রচনার সূত্রপাত। অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক এই বিষয়কে নিয়ে পিএইচডি করার বাসনা নিয়ে নিয়ত প্রচেষ্টা করে চলেছেন শঙ্করী। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে "আন্তর্জাতিক বাংলা বিদ্যাচর্চা সম্মেলন ২০১১"-তে তাঁর এই গবেষণার বিষয়বস্তুকে বহু গুণী মানুষ উৎসাহিত করেছেন এবং তাকে নানাভাবে এ কাজে অগ্রসর হবার জন্য মনোবল জুগিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, খ্যাতনামা লেখক ড. হাসান আজিজুল হক, বাংলা একাডেমির ড. তপন বাগচি যাঁদের মধ্যে প্রমুখ। শঙ্করী খুব কাছ থেকে দেখেছেন নারীর জীবনের বঞ্চনা আর হতাশা। অল্প বয়স থেকেই তার মনে গড়ে উঠেছে এমন এক চেতনা-এর থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবহেলিত জীবনের হাহাকারের বেদনা তার মনের ভেতর প্রতিনিয়তই অনুরণিত হয়েছে। তারই ফলস্বরূপ এই পরিণত বয়সে এমন একটি জটিল চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হওয়া। আশা রাখি তার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়।